# চিন্তন

একটি মার্কসীয় অন্বেষণ প্রয়াস

ষষ্ঠ সংখ্যা • এপ্রিল ২০০৯

# চিন্তন

*একটি মার্কসীয় অন্বেষণ প্রয়াস*

সম্পাদকীয়

অজানা পর্বতশিখরে আরোহণের সাহস
প্রশান্ত রায়

নেপালের বিপ্লবী আন্দোলন কোন্ পথে
বিশ্বজিৎ হাজরা

মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের সমস্যা:
আজকের তত্ত্বগত সংগ্রামের গুরুত্ব ও স্বরূপ
দীপক বক্সী

সম্পাদক: দীপক বক্সী
প্রকাশক: কুশল দেবনাথ এন ২৬৮/৩/ডি, ফতেপুর সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০২৪
দূরভাষ: ৯৮৩০১ ৪৭৫৫৯
মুদ্রক: সুমুদ্রণ, ৩০/১বি কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯

**সম্পাদকীয়**

# নতুন সময়, নতুন আশার সময়

‘চিন্তন’ পত্রিকা অনেকদিন পর প্রকাশিত হচ্ছে। এর কারণ হিসাবে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া জরুরি। জন্মলগ্নে এই পত্রিকার সাথে যুক্ত কর্মী-সংগঠকেরা কিছু বাস্তব-বর্জিত শুকনো তত্ত্বচর্চার স্বপ্ন নিয়ে এ কাজ শুরু করেননি। এক প্রকৃত ‘মার্কসীয় অন্বেষণ প্রয়াস’ হিসাবে তারা তত্ত্বচর্চাকে বাস্তব কর্মকাণ্ড অনুশীলনের কার্যকরী দিশা হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন। বর্তমান ‘কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের’ বাস্তব দিশাহীনতা, মার্কসবাদ লেনিনবাদ-এ বিশ্বাস-এর নামে নিখাদ ‘অন্ধত্ব’, কমিউনিস্ট সুলভ আদর্শ-নিষ্ঠা ও উন্নত সাংস্কৃতিক বোধ থেকে বড় ধরনের বিচ্যুতি, বিশ্বজোড়া কমিউনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্ব ও প্রয়োগগতভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া— এসব কিছুর বিরুদ্ধে জোরালো বিদ্রোহ ঘোষণা করার আকাঙ্ক্ষাই ‘চিন্তন’-এর প্রকাশনার পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল।

অ্যাকাডেমিকস্-এ এক ধরনের মার্কসবাদ চর্চা হয়। তা যে পৃথিবীকে বদলানোর সংগ্রামে কোনো কাজে আসে না, তা নয়। কখনো তা নেতিবাচকভাবে, কখনো বা ইতিবাচক-ভাবেই কমিউনিস্ট সংগঠনের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বচর্চা, সমসাময়িক বিপ্লবী তত্ত্ব গড়ে ওঠাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু তা কখনই সরাসরি সমাজ পরিবর্তনের দিশা নির্মাণকারী দলিল হয়ে উঠতে পারে না, কারণ বাস্তব জীবন আর তত্ত্বের মধ্যে যে ফাঁক, জীবনের সাথে তত্ত্বের বারবার সংযোগ, সম্মিলন, সংঘর্ষের অন্তহীন প্রক্রিয়াতেই তা শুধু বিপ্লবী তত্ত্ব, বিপ্লবের-পরিবর্তনের ইস্তাহার হয়ে ওঠে।

‘চিন্তন’ পত্রিকা-কে ঘোষণায় এক মার্কসীয় অন্বেষণ প্রয়াস হওয়ার সাথে যদি প্রকৃতই বিপ্লবী তত্ত্ব নির্মাণের এক কাণ্ডারি হতে হয়, তা তত্ত্বচর্চাকে যদি প্রকৃত অর্থে তত্ত্বচর্চার দিশারী আর দৈনন্দিন শ্রেণিসংগ্রামে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত চিন্তার ধারক-বাহক হতে হয়, তবে তার লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আর তার সঙ্গী-সাথীদের নিছকই প্রবন্ধকার হলে চলে না। ১৫০ বছরের অনুশীলিত তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন-নিঃসৃত উপলব্ধি সমসাময়িক বৈপ্লবিক তত্ত্ব নির্মাণকে যেমন প্রভাবিত করবে, নতুন ভাবনার জন্য দরজা খুলে দেবে, তার সাথে সাথেই প্রয়োজনীয় করে তুলবে শত সহস্র পূর্বসূরীদের দেখানো পথে আরও আদর্শনিষ্ঠ, নতুনতর পথচলা।

গত ১৬০ বছরের কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসঙ্গে, তার সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে, মহান শিক্ষকদের তত্ত্ব ও তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিশ্বজুড়ে ক্ষীণ হলেও, আলোচনা জারি আছে. বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে, সমাজবিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রে, ‘কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহের’ অন্দরমহলে অথবা ঘোষণায়। কখনও কখনও তা সমস্যার গভীরতম আপাত-অধরা কেন্দ্রগুলিকেও ছুঁয়ে যায়। কিন্তু, এই গবেষণা-পর্যালোচনা-চর্চা আজকের পৃথিবীতে কিভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে, তা পরীক্ষা করতে গেলে, নতুনতর চিন্তাকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ‘ল্যাবরেটরিতে’ নিরীক্ষণ করতে হলে, তাকে যথাযথ উপাদান-সহ, যথাযথ তীব্রতায়, মাত্রায় ও পদ্ধতিতে উপস্থিত করতে হবে। রসায়নের ল্যাবটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গেলে যেমন চাপ, তাপমাত্রা, সময়, বিকিরক সমূহের যথাযথ না হওয়াটা, পরীক্ষাটির ব্যর্থতাকে নিশ্চিত করে— যা থেকে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বটির নির্ভুলতা সম্পর্কে কোনো ধারণা করা সম্ভব হয় না, তেমনই সমাজবিজ্ঞানেও মূল কথাটা একই রকমের। একটি নতুন চিন্তা বৈপ্লবিক সংগ্রামের বহু পথ সাফল্যের সঙ্গে পেরিয়ে  পরীক্ষিত তত্ত্ব হিসাবে, বিপ্লবী তত্ত্ব হিসেবে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের কর্মনীতি-কর্মসূচিতে স্থান পায়। আর তার জন্যই, চিন্তা থেকে তত্ত্বের উত্তরণের, অনুশীলিত তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন থেকে নতুনতর উপলব্ধিতে পৌঁছানোর সঙ্গে জুড়ে আছে প্রয়োগ-অনুশীলনের এক কার্যকরী পর্ব। আর এই পর্ব লেনিনীয় ‘পেশাদারিত্ব’ ছাড়া অন্য কিছুতে ফলদায়ক হতে পারে না। পেশাদারিত্ব মিছিল-এ, মিটিং-এ, জনসমাবেশে, সংঘর্ষে, আত্মবলিদানে, সশস্ত্র প্রতিরোধে, পেশদারিত্ব মননে, পেশাদারিত্ব যা কিছু পচনশীল, অবক্ষয়ী— তার নির্মম অপসারণে, পেশাদারিত্ব যা কিছু নতুন চিন্তা— প্রয়োগ-পরীক্ষার যোগ্য বলে বিবেচিত— তার দৃঢ়, কঠিন, সুনিপুণ প্রয়োগ-রূপায়নে, পেশদারিত্ব নির্মোহ ফল-বিশ্লেষণে, আত্ম-বিশ্লেষণেও।

বর্তমান পৃথিবীর কমিউনিস্ট আন্দোলনে একদিকে মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের সমস্যাকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া যেমন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশের সামনে এক গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি বিপরীতে যারা এর গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছেন তাদের কর্মকাণ্ডে— প্রয়োগে এবং মননে— পেশাদারিত্বের অভাব এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। ‘চিন্তন’ও এই শক্তিশালী অবৈপ্লবিক প্রবণতার বাইরে নয়— এই অকপট স্বীকারোক্তি দিয়েই, একে অতিক্রম করার শপথ নিয়েই নতুন করে ‘চিন্তন’-এর বর্তমান প্রকাশনা।

এই প্রেক্ষাপট থেকে ‘চিন্তন’-এর নতুন যাত্রায়, এবারের সংখ্যায় স্থান পেয়েছে তিনটি প্রবন্ধ। সমকালীন সময়ের আরও বহু কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে— যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে স্থান দেওয়া গেল না। নেপালের বিপ্লবী আন্দোলন বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। একটি লেখা, ‘অজানা পর্বতশিখরে আরোহণের সাহস’ নেপালের সংবিধান সভা নির্বাচনের আগে রচিত, ‘চিন্তন’-এর সম-মনোভাবাপন্ন পত্রিকা ‘মার্কসিস্ট ইন্টেলেকশন’-এ প্রকাশিত লেখার বাংলা অনুবাদ। অপর লেখাটি, “নেপালের বিপ্লবী আন্দোলন কোন্ পথে?”-তে, CPN(M) [বর্তমানে UCPN(M)]-এর মৌলিক রণনীতি-রণকৌশলের সঠিকত্বের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যার পাশাপাশি নির্বাচন পরবর্তী অনুসৃত ‘রণকৌশলে’ (প্রকৃতপক্ষে রণনীতি) যে মারাত্মক দক্ষিণপন্থী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে UCPN(M)-এর অভ্যন্তরে যে সর্বস্তরের কর্মীবাহিনীতে এক বিদ্রোহী মানসিকতা, বিপ্লবের প্রতি আকুতি ও সময়ের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ বিপ্লবী রণনীতি-রণকৌশল খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চলছে তাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবত নেপালে বিপ্লব অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় বর্তমানে এক জটিল সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। নির্বাচিত সংবিধান সভার প্রায় ৫৫% ঘোষিতভাবে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র চায়— অবশ্যই তাও কোনো বৈপ্লবিক কায়দায় নয়, ধীর গতি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে। ৪৫% UCPN(M)-এর সদস্য। এদের আবার অর্ধেক শক্তি যদি রাজতন্ত্রকে হটিয়ে, বাকি কাজটা সামন্ত-প্রতিনিধি, দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধি, সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ট এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের এজেন্টদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে চালাতে চান, তাহলে যে নেপাল অতন্ত ধীর গতিতে, খুব বেশি হলে এক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের দিকে এগোতে থাকবে (আজকের নেপাল আমাদের মতে আধ-সামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক)— এতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সংবিধান সভার প্রায় ৭৫% প্রতিনিধির আকাঙ্ক্ষা বাইরে থেকে তেমনই মনে হচ্ছে। যদিও ঘটনাক্রম এভাবেই

গড়াতে থাকবে— এটা ধরে নিতে আমরা রাজি নই। ৭ হাজার শহিদের স্মৃতি সারা দেশজুড়ে বয়ে বেড়াচ্ছেন যে বীর বিপ্লবীরা, তারা এত সহজে আত্মসমর্পণ করবেন, এটা ভেবে নেওয়ার সময় এখনও আসেনি। UCP(N)-এর ভেতরকার মতবিরোধ তাই গোটা বিশ্বের কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন সংগঠন সমূহ ও ব্যক্তিবর্গের কাছে এক গভীর উদ্বেগের ও অস্থিরতার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। UPRC (ইউনাইটেড পিপলস রিভলিউশনারি কাউন্সিল)-কে পুরোপুরি অকেজো করে দেওয়া, এবং কোনো ঐক্যবদ্ধ 'পিপলস্ রিপাবলিকে'র সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগেই 'পিপলস লিবারেশন আর্মি'র সাথে 'নেপাল আর্মি'র একীকরণের জন্য কমরেড প্রচণ্ড-র অভাবনীয় উদ্যোগ— বিপ্লবকে ভ্রান্ত দিশায় পরিচালিত করছে— এ বিষয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই।

তৃতীয় রচনাটি, 'মার্কসীয় দর্শন ও মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের সমস্যা', 'মার্কসিস্ট ইন্টেলেকশনে' প্রকাশিত মূল রচনার বঙ্গানুবাদ। মার্কসীয় তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন- পুনঃসূত্রায়নে যে দিশা নিয়ে 'চিন্তন' কাজ শুরু করেছিল তারই অংশ হিসেবে মার্কসীয় দর্শনের মৌলিক ভিত্তি-র স্বরূপটি যথাযথভাবে বোঝার একটি চেষ্টা চালানো হয়েছে প্রবন্ধটিতে। পাশাপাশি, মহান শিক্ষকদের বিভিন্ন রচনায় এবিষয়ে যেসব ভিন্ন ধারার দৃষ্টিভঙ্গি-সমূহ প্রতিফলিত হয়েছে এবং তা নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের সমস্যার প্রধান ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সাথে এই বিকাশের আন্তঃসম্পর্ককে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

যে সময়ে 'চিন্তন'-এর বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে তখন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল আন্তর্জাতিক পুঁজির এক তীব্র সঙ্কট, যাকে শুধু ১৯৩০-র দশকের সঙ্কটের সাথেই তুলনা করা চলে। সঙ্কট এমন একটা সময়ে শুরু হয়েছে যখন এমনিতেই আমেরিকার GDP বৃদ্ধির হার ২.৪%, জাপানের ১.৯%, ইউরোপীয় বৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির গড় GDP বৃদ্ধির হার ৩%-এর নীচে। বিতর্ক চলছে— অবস্থা কার বেশি খারাপ হতে চলেছে— আমেরিকা না ব্রিটেনের। বিশ্ব-পুঁজির কেন্দ্র থেকে প্রায়শই যৌথ ঘোষণা শোনা যাচ্ছে— "এই সঙ্কট থেকে আমরা দ্রুতই বেরিয়ে আসব।" 'উদীয়মান' পুঁজিবাদী রাষ্ট্র চীন-এর GDP বৃদ্ধির হার ৯.৫% থেকে ৭.৫%, তারপর ৭.১%, তারপর ৫.৮ হতে চলেছে (সরকারি পূর্বানুমান অনুযায়ী)। IMF-এর ঘোষণা অনুযায়ী ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে এই হার ভারতে নেমে দাঁড়াবে ৫.২৫%। ফ্রান্সে, ব্রিটেনে, জাপানে, জার্মানিতে একটু একটু করে শ্রমিক আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণে বিস্তারিত চর্চা প্রয়োজন। প্রস্তুতির অভবে এবারের 'চিন্তন'-এ তার কোনো প্রচেষ্টাকে স্থান দেওয়া গেল না।

অন্য বিষয়টি একেবারেই জাতীয় বিষয় হলেও এরও একটা আন্তর্জাতিক তাৎপর্য রয়েছে। সেটি হল, সিপিআই(এম)-এর পূর্ণাঙ্গ 'বুর্জোয়া পার্টি'তে রূপান্তর। বার্নস্টাইনবাদ, কাউটস্কিবাদ এবং ক্রুশ্চেভবাদ-এর 'সৃজনশীল' তত্ত্বায়ন-সূত্রায়ন ঘটাতে ঘটাতে ১৯৯০-এর দশকে এসে ভারতবর্ষে নয়া-উদারনীতির ধাক্কায় যখন সে মানব-দরদী, জনমুখী, পুঁজিবাদী উন্নয়নের 'সৃজনশীল তত্ত্ব' আমদানি করল, তখনও দেশের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন জনসাধারণের বেশিরভাগই ভেবেছিলেন এটাই 'আজকের মার্কসবাদ'। কিন্তু সিপিআই(এম)-এর সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম-এর নৃশংস হত্যালীলা, ক্যাডার, ভাড়া করা পেশাদার হত্যাকারী ও সরকারি পুলিশের 'অভূতপূর্ব' তাণ্ডব চালিয়েও যখন জনগণের প্রতিরোধ ভাঙা গেল না, তখন একটা বড় অংশের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষের কাছেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এটা কোন 'মার্কসবাদ' নয়, এটা নির্জলা পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ বরবারই নির্মম, নিষ্ঠুর। একবিংশ শতাব্দীতে তার নিষ্ঠুরতা কমেনি, বরং বেড়েছে বহুগুণ। আর বিশ্ব-পুঁজির প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে, আইএমএফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের 'জনকল্যাণ'-এর কর্মসূচি রূপায়ণ করতে যারা যতটা দৃঢ়তা নিয়ে নামবেন, নাম তার যাই হোক, কর্মসূচিতে তার যাই লেখা হোক, পুঁজিবাদী পার্টিতে রূপান্তর তাদের ততটাই দ্রুত ঘটতে থাকবে। সিপিআই(এম)-এর অভ্যন্তরে এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়েছে। এরা তাই ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী বুর্জোয়া দলগুলির একটি। SEZ আইন এরা তৈরি করে ফেলেছিল কেন্দ্রীয় সরকারেরও আগে। SEZ অঞ্চলকে বিদেশি-ভূমি হিসেবে দেখতে হবে, তা লিখতে (২০০৩ সালেই) এদের হাত কাঁপেনি, যেমন নন্দীগ্রামে নৃশংস হত্যালীলা চালিয়েও বিবৃতির ফোয়ারা ছোটাতে এদের বুক কাঁপে না। এই হল বুর্জোয়া পেশদারিত্ব।

সিপিআই(এম)-এর রূপান্তর প্রক্রিয়াটির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য এখানেই যে বিশ্বপুঁজির শক্তিশালী কেন্দ্রটির সঙ্গে যে সব পার্টি প্রকৃতই 'বন্ধুত্ব' স্থাপন করেছে ১৯৯০-এর দশকের পর ভারতবর্ষের মতো দেশে তাদের 'জনগণের বন্ধুত্বের' মুখোশটি খুলে ফেলতেই হবে। সিপিআই(এম), সিপিআই-এর মতো পার্টিগুলির এই মুখোশ শুধু জাতীয় স্তরে নয়, আন্তর্জাতিকভাবেই সচেতন বামপন্থী মানুষদের কাছে অনেকটা উন্মোচিত হয়ে গেছে।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম)-এর এই স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি বামপন্থী আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে শূন্যতা বজায় রয়েছে, তাতে তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস জোটের উত্থান— এক 'পরিবর্তনের হাওয়া'র রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। নয়া উদারনীতির প্রয়োগ করার প্রশ্নে কংগ্রেস যে-কোনো মতেই সিপিআই(এম)-এর থেকে দুর্বল শক্তি নয়, এই সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করে তৃণমূল কংগ্রেস তার বুর্জোয়া চরিত্রকে সজোরে সামনে নিয়ে এসেছে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সংগ্রামী মানুষদের পাশে থাকা, SEZ বিরোধিতার প্রশ্নে সংগ্রামী অবস্থান নেওয়া, তৃণমূলের পক্ষে যে এক 'ভোট বাড়ানোর কৌশল' ছিল, তা কংগ্রেসের সাথে জোট গঠন করে তারা স্পষ্ট করে দিয়েছে। এর সাথে সাথে বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশের এই প্রতিক্রিয়াশীল জোটে যোগদান পশ্চিমবঙ্গে গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষকে এক বড় ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

এই জটিল পরিস্থিতিতে সংগ্রামী বামপন্থীর ঝান্ডা যাদের তুলে ধরার কথা ছিড়, যাদের দায়িত্ব ছিল এক সংগ্রামী বাম ঐক্য-কে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে তুলে ধরার, তারা সে কাজে চূড়ান্ত দিশাহীনতার পরিচয় দিয়েছে। কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসেবে পরিচিত কেউ কেউ বাস্তবত তৃণমূল কংগ্রেসের লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ মুসলিম মৌলবাদীদের সঙ্গে রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠন থেকে শুরু করে 'ডিফিট সিপিএম'-এর স্লোগান সহ সব ধরনের রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলেছেন। SUCI এমপি জেতার আশায় তৃণমূলের সঙ্গে এক প্রতিক্রিয়াশীল জোটের অংশ হয়ে গেছে, CPI(ML) লিবারেশন সারা দেশে বাম আন্দোলনের নেতৃত্ব CPI(M)-এর হাতে তুলে দিয়ে বিহার, উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী জোট গঠন করেছে। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের বাম ও বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন মানুষদের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে এসে ঠেকেছে। পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীন সংগ্রামী বাম-আন্দোলন এই বিভ্রান্তির মধ্যেই আটকে রয়েছে।

এমন এক নতুন পরিস্থিতিতে, যখন 'কমিউনিস্ট বিপ্লবী' শক্তিগুলির পক্ষে নিজেদের স্বরূপ ও ভূমিকা মেহনতি জনতার একটা বড় অংশের কাছে তুলে ধরা সম্ভব, বলা বাহুল্য, তা হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা, রাজনৈতিক আন্দোলনে আরও বড় মাত্রায় তার অংশগ্রহণ, ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষকদের কাছে আরও বড় সংখ্যায় বুর্জোয়া দলগুলির (সিপিএম থেকে তৃণমূল) স্বরূপকে নতুন করে তুলে ধরা ও মেহনতিদের এই অংশের মানুষদের প্রকৃত বিপ্লবী অবস্থান গ্রহণ পরিস্থিতির এক গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। এই ঘটনা বাস্তবে ঘটবে কিনা, কোনো এক বা একাধিক কমিউনিস্ট সংগঠন এর সফল কারিগর হিসেবে উঠে আসতে পারে কিনা, বিপ্লবী-বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষদের কাছে সেটাই এক কঠিন প্রশ্ন, আবার তার জন্য আন্তরিক অপেক্ষারও বিষয়। 'চিন্তন'ও সেই অপেক্ষার শরিক। 'চিন্তন' তার সাধ্য ও সীমাবদ্ধতা নিয়েও সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার জন্য যে কর্মকাণ্ড তার শরিক থাকতে চায়।

# অজানা পর্বতশিখরে আরোহণের সাহস

প্রশান্ত রায়

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে এই শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত নেপালের ঘটনাবলির বিকাশের উপর সারা বিশ্বের বিপ্লবী জনগণের ও কমিউনিস্টদের নজর নিবদ্ধ। নিজ নিজ দেশে বিপ্লব করতে উৎসুক হাজার হাজার মানুষের কাছে নেপালের সিপিএন(এম)-এর নেতৃত্বে চলমান বিপ্লবী সংগ্রাম হয়ে উঠেছে এক আলোকবর্তিকা, প্রেরণার একমাত্র উৎস। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সফলভাবে একনাগাড়ে একটি সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াটাই এই পার্টিটির প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের একমাত্র কারণ বলে ভাবলে তা হবে অতিসরলীকরণ। বিশ্বের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নানান কমিউনিস্ট পার্টিই এরকম দীর্ঘ, এমনকি দীর্ঘতর সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছে। কিন্তু তাতে সেই পার্টিগুলিকে নিয়ে এরকম গভীর উৎসাহ দেখা যায়নি। এর কারণ এই যে, সিপিএন(এম) প্রথম থেকেই যে বিরল ধরনের সৃজনশীলতা দেখিয়েছে তা ওই পার্টিগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। মার্কসবাদ যে এমনকি মার্কসবাদ সম্পর্কেও সমালোচনামূলক মনোভাব দেখাতে শেখায়, একথা যে-কোনো প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টির ভোলা উচিত নয়, এবং কেউ মার্কসবাদের পথে চলছে না অন্য পথে, বিপ্লবী অনুশীলনই যে সেটা যাচাই করার পরীক্ষাগার— এই গভীর বিশ্বাস, ও সেই বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করার জন্য সাহসী ও বিরামহীন প্রচেষ্টা এই পার্টির সব কাজের মধ্যে একটা সজীবতা ও প্রাণময়তা সঞ্চার করেছে। একদিকে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতিকে শক্তভাবে ধরে রাখা আর অন্যদিকে রণকৌশলগত প্রশ্নে দারুন নমনীয়তা দেখানো— এ দুইয়ের এক বিরল সংযোগ দেখিয়েছে সিপিএন(এম)।

নেপালের বিপ্লব থেকে, বিশেষত সিপিএন(এম)-এর তাত্ত্বিক ধারণাসমূহ থেকে শিক্ষা নেওয়া ভারতের বিপ্লবীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন কখনো দক্ষিণপন্থা কখনো বা বামপন্থার দিকে ভয়ানকভাবে দোদুল্যমান থেকেছে। এই প্রবণতা ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যসমূহের স্বাভাবিক পরিণতি। এটির শিকড় তাই অনেক গভীরে, এটির বিরুদ্ধে লড়াইও কঠিন। এই সঙ্কট থেকে রেহাই পাওয়ার ক্ষেত্রে সচেতনতার ভূমিকাটি নির্ধারক। সেকারণে, যে সিপিএন(এম) এ ব্যাপারে অনুকরণযোগ্য ভূমিকা রেখেছে তাদের রাজনৈতিক লাইন অনুধাবন করা দরকার, সেটি হৃদয়ঙ্গম করা দরকার ভারতের কমিউনিস্টদের।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি খুব ঘৃণিত ব্যাপার। তার স্বরূপ সবার কাছে উন্মোচিত। 'বাম' বিচ্যুতি যেহেতু অনেক আত্মত্যাগ ও আত্মনিবেদন নিয়ে আসে, তাই এটি বরং একধরনের সম্ভ্রম জাগায়। এর ফলে এই লাইন অনুসরণ করা কমরডেদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পায়, তারা নিজেদের প্রশ্ন করতে ভুলে যায়। এর ফলে ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের এই ধরনের কমরেডদের, বিশেষত মাওবাদীদের, নেপালের কমরেডদের তত্ত্ব ও অনুশীলন থেকে শেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ এই নয় যে অন্যদের কিছু কম শেখবার আছে। বিপ্লব করার প্রশ্নে অন্যদের হয়তো আরও বেশি কিছুই শেখার আছে।

একেবারে প্রথমেই সিপিএন(এম)-এর রাজনৈতিক লাইনের প্রধান জোরের দিকটিকে চিহ্নিত করা যাক। এটি হল রাজনীতিকে সর্বদা নিয়ন্ত্রক ভূমিকায় রাখা। সশস্ত্র সংগ্রাম যদিও সর্বহারার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য একটি অপরিহার্য উপায়, আর তাই এটি ওই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অধীন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে কিন্তু সবসময়েই এ দুটির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে সমস্যা দেখা গেছে। প্রধান ঝোঁকটি থেকেছে এই দুটি দিকের কোনো একটিকে একমাত্র দিক করে তোলা, আর তার ফলে দেখা গেছে হয় সংস্কারবাদ নয়তো সমরবাদ। এ দুটির মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ককে সঠিকভাবে নির্ধারণ করে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রক ভূমিকায় রাখতে পারাটা সিপিএন(এম)-এর বিশেষ কৃতিত্ব।

এই মৌলিক অভিমুখ নিয়ে সিপিএন(এম)-এর কমরেডরা আমাদের প্রতিবেশী দেশটিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সেটি কারোর কারোর কাছে বর্ণময়, আবার কারোর কাছে বা অধরা, কিন্তু যে দারুন মনোগ্রাহী তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের দক্ষিণপন্থীরা তাদের বামপন্থী নৈরাজ্যবাদী বলে অবজ্ঞা করে, আর গোঁড়ামিপন্থীরা তাদের কিছু কিছু 'দক্ষিণপন্থী' ঝোঁক নিয়ে দুঃখ পায়। কিন্তু সিপিএন(এম) যখন এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয় যেটি তাদের পক্ষে যায় তখন আবার এরা তাদের অবস্থান পাল্টাতে বাধ্য হয়। আর এখানেই সিপিএন(এম)-এর মূল শক্তি নিহিত। তার আইনি ও বেআইনি, গোপন ও প্রকাশ্য, সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রামের সুচারু সমাহার বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দুই বিচ্যুতির পথিকদেরই বিভ্রান্ত করে দেয়। কিন্তু সিপিএন(এম)-এর এই বিশেষ গুণটিই, এবং নেপালের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী বিপ্লবী তত্ত্ব 'বিকশিত' করার স্পর্ধাই আবার তাদের সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের চমৎকার এক শিক্ষকে পরিণত করেছে।

এই প্রবন্ধে আমরা সিপিএন(এম)-এর মৌলিক রাজনৈতিক বক্তব্যগুলির কয়েকটি সংক্ষেপে বর্ণনা করবো। এর মধ্যে সৃষ্টিশীলতার ছাপ আছে, একধরনের নতুনত্ব আছে, যার থেকে আমাদের, ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের, অনেক কিছু শেখার আছে। আবার এর পাশাপাশি আমরা তাদের তাত্ত্বিক ধারণার কিছু দুর্বলতার দিকেও অঙ্গুলিনির্দেশ করার চেষ্টা করবো।

## রাষ্ট্রের প্রশ্ন

এটার দুটো দিক আছে। একদিকে আছে নেপালের বিদ্যমান রাষ্ট্রের ধ্বংসের পর রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণা। আর একদিকে আছে যেসব দেশে সর্বহারারা ক্ষমতা দখল করেছে, সেসব দেশে ক্ষমতা দখলের পরবর্তীকালে রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ সমস্যা। প্রথম দিকটি সম্পর্কে বলা যায় যে, দশ বছর সশস্ত্র সংগ্রাম চালানোর পর, এবং এই সংগ্রামের ফলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পুরনো রাষ্ট্রটি ধ্বংস করার পর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ক্ষমতার ভ্রূণ হিসাবে ইউনাইটেড রেভলিউশনারি পিপলস কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। রেভলিউশনারি পিপলস কাউন্সিলের প্রথম জাতীয় কনভেনশনে যে ৭৫ দফা 'সর্বনিম্ন সাধারণ নীতি ও কর্মসূচি' গৃহীত হয় তার থেকে সে সময় যে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল তার একটা সাধারণ চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে পার্টির ধরাণায় ও কর্মসূচিতে একটা নির্ধারক ধরনের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন ঘটে বাস্তবকে পরিষ্কারভাবে বোঝা ও বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়ার কারণে। এটা ছিল এক ধরনের পিছু হটা। আর সে কারণেই সোজাসাপ্টা পথে চলার তুলনায় এটা করার জন্য বেশি সাহস, আত্মবিশ্বাস ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়েছিল। "আলোচনার

জন্য সিপিএন(এম)-এর প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ”-এ পার্টি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাব রাখে। পার্টির মনে হয়েছিল যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত করার জন্য এটা সর্বনিম্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক সমাধান, আর এই পথে এগোনোর ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার গুরুত্ব থাকবে খুব বেশি। পার্টি মনে করেছিল যে, বুর্জোয়া সংসদবাদ পেরিয়ে নয়া গণতন্ত্রের দিকে উত্তরণের জন্য একটি পদক্ষেপ হবে এটি। তবে এটি নয়া গণতন্ত্রের চেয়ে নিচু একটা স্তর। পার্টি মনে করেছিল যে তাত্ত্বিকভাবে ও দেশের নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটিই হবে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত পদক্ষেপ।

রণনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আসলে পরিবর্তিত হতে থাকা পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক মূল্যায়ন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সুচারুভাবে মানিয়ে নেবার একটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ২০০৩ সালে শক্তির বিন্যাস ছিল রণনীতিগত ভারসাম্যের জায়গায়। এই সময়ে যত বেশি সম্ভব রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে একজোট হওয়া দরকার ছিল। এমন একটা সময় যখন রাজতন্ত্র চরম ক্ষমতা দখল করে আছে, তারা সংবিধান ধ্বংস করে ফেলেছে, রাজতন্ত্রের পশ্চাদমুখিনতা তার পরিক্রমা শেষ করেছে। সংসদীয় শক্তির ওপরের অংশটা, সামন্ততন্ত্র, কম্প্রাডর বুর্জোয়া ও আমলা পুঁজির প্রতিনিধিরা, জোরালোভাবে রাজার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। নীচের ও মাঝের অংশগুলো জোট বাঁধলো বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে। এভাবে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক, সংসদীয় ও রাজতন্ত্রের শক্তির ত্রিমুখী ব্যবস্থা একটা দ্বিমুখী ব্যবস্থার দিকে এগোতে থাকলো। শেষ আঘাত হানার আগে এইসব সম্ভাব্য শক্তিগুলিকে ভালভাবে জোটবদ্ধ করার জন্য সময় দরকার ছিল। নেপালের বিপ্লবের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন জোগাড় করার জন্যও সময়ের দরকার ছিল, কারণ সেখানে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করতে চলেছিল এমন একটা অঞ্চলে যেটি একটি খুব সংবেদনশীল ভৌগোলিক-রাজনৈতিক অঞ্চল। ভারত ও চীন, দুই বৃহৎ শক্তির মাঝখানে চিঁড়েচ্যাপ্টা। এই সব কারণে শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্মসূচি, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কর্মসূচি, খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল। সারা দেশ জুড়ে জনগণের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠক, প্রজাতন্ত্র ও সংবিধান সভার স্লোগানকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছিল।

আক্রমণ ও আত্মরক্ষার মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে নেপালের মাওবাদীদের এই ছিল মৌলিক ধারণা। অনেক রণকৌশলগত পদক্ষেপ ও সুদক্ষ পরিকল্পনা এসেছে এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই। সিপিএন(এম)-এর এই পদক্ষেপগুলিতে অনেকের চোখই কপালে উঠেছে। আরও অনেককেই তা বিস্মিত করেছে। এ নিয়ে তাই দু-চার কথা বলে নিই। প্রথমত, আমাদের বলা দরকার যে ভারতের বিপ্লবীদের একটা বড় অংশের কাছেই কোনো আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক দেশে নির্বাচনে অংশগ্রহণ একটি গর্হিত কাজ। এই ঘটনাটি এই কমরেডদের শিক্ষা দেবে যে, ১৯৯১ সালে সিপিএন(এম) যে শুধু নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল ও সংসদে ৯টি আসন জিতেছিল তাই নয়, তাদের রাজনৈতিক প্রস্তাবে এখনো রয়েছে যে, “একেবারে সংসদের মাটিতে দাঁড়িয়েও সংসদীয় ব্যবস্থার অসারতা সম্পর্কে রাজনৈতিক আক্রমণের কোনো সুযোগই আমরা সামান্য সময়ের জন্যও ছাড়িনি। প্রকৃতপক্ষে সব ফ্রন্টেই আমরা জনযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছি ...।” (*দি ওয়ার্কার*, সংখ্যা ১১, পৃ. ১৯) বক্তব্য পরিষ্কার। পার্টির সাধারণ অভিমুখ যদি ঠিক থাকে তবে সংসদীয় কাজকর্মও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির অংশ হতে পারে। আর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে অংশগ্রহণ সম্পর্কে, আমরা আগেই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের যৌক্তিকতা নিয়ে সিপিএন(এম)-এর বক্তব্য সংক্ষেপে বলেছি। পার্টি কেন সরকারে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে সেখানেই। সিপিএন(এম)-এর সরকারে যোগদান বা এপ্রিল অভ্যুত্থানের আগে SPA-এর সঙ্গে মোর্চা গঠন আমাদের দেশের নাক-উঁচু দক্ষিণপন্থীদের যেমন অসহায় করে তুলেছে, তেমনই তা অতি-বামপন্থী কমরেডদেরও ক্রোধের কারণ হয়েছে। কিন্তু তার মাত্র কয়েক মাস পরেই সিপিএন(এম) যখন মন্ত্রীসভা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল তখন আমাদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুরা কতটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন আমরা তার সবটা জানি না, কিন্তু আমাদের অতি-বামপন্থী বন্ধুরা যে আনন্দে ডগোমগো হয়ে উঠলেন তাতে সন্দেহ নেই। নেপালের কমরেডদের কাছে কিন্তু সরকারে যোগ দেওয়া আর সরকার ছাড়া, দুটো সিদ্ধান্তের কারণই জলের মতো পরিষ্কার ছিল। ২০০৭ সালের ৩ থেকে ৮ আগস্ট সিপিএন(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম বর্ধিত সভায়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন ২১৭৪ জন কমরেড, দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চালানোর পর সরকার ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই সভায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার একটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাক। “অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যাতে চুক্তিমতো (১২ দফা চুক্তি) চলে, তার গ্যারান্টির ব্যবস্থা যদি না করা যায়, সংবিধান সভা নির্বাচনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও পশ্চাৎমুখী সামন্ততান্ত্রিক ষড়যন্ত্র **যদি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা মাধ্যমে** বন্ধ করা না যায় তবে সরকার ছেড়ে আন্দোলনে নামা ছাড়া সিপিএন(মাওবাদী)-র কোনো উপায় থাকবে না ...।” এর সঙ্গে যোগ করুন পরবর্তী প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পার্টির আত্মসমালোচনা— “সংসদীয় দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা করার সময় এই চুক্তির কথা জনগণকে জানানো উচিত ছিল, তাদের যত দূর সম্ভব সাথে নেওয়া উচিত ছিল, বিশেষত পার্টি যখন বালুওয়াটার রুমে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফেডারেল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সংগ্রাম বজায় রাখার কথা জনগণকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে মাওবাদীরা মধেশ প্রশ্নে তাদের ঘোষিত কর্মসূচি ত্যাগ করেছে বলে গুজব রটিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির সুযোগ পেয়ে গেল প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীরা।”

প্রতিটি সুযোগকেই বিপ্লবের কাজে লাগানোর এই সাধারণ অভিমুখ অনুসারেই নেপালের মাওবাদীরা আলাপ-আলোচনার অস্ত্রটিকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে থাকেন। ২২ নভেম্বর ২০০৫-এর ১২ দফা বোঝাপড়া, ১৬ জুন ২০০৬-এর ৮ দফা চুক্তি, ৮ নভেম্বর ২০০৬-এর ৬ দফা চুক্তি— এগুলো সবই সিপিএন(এম)-এর এই ধারণার ফসল। এই পার্টিটির কাছে আলাপ-আলোচনা শুধুমাত্র শেষ আক্রমণ হানার আগে কিছুটা সময় পাওয়ার ব্যাপার নয়, এগুলি তাদের কাছে সংগ্রামের উচ্চতর স্তরে যাওয়ার জন্য গুণগত উল্লম্ফনের একটি উপায়। প্রতিটি আলাপ-আলোচনাকেই তাদের বিপ্লবকে ‘গুণগতভাবে আরও উচ্চস্তরে’ নিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তি সংগ্রহের কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন নেপালের কমরেডরা।

নতুন ধরনের সর্বহারা রাষ্ট্র (নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও যার মধ্যে পড়ে) সম্পর্কে সত্যিকারের সিরিয়াস চিন্তার পরিচয় রাখছে সিপিএন(এম)। এই সব রাষ্ট্রগুলির বুর্জোয়া রাষ্ট্রে অধঃপতনের সমস্যাটিকে তারা খুঁটিয়ে বিচার করেছেন। প্যারি কমিউনের শিক্ষা ও “স্থায়ী সামরিক বাহিনী **বিহীন,** জনগণের বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনী **বিহীন**, জনগণের মাথার ওপরে কর্তৃপক্ষ **বিহীন** রাষ্ট্র” নিয়ে লেনিনের বক্তব্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি নেপালের কমরেডরা এই সমস্যার শেষ উত্তর খুঁজে পাচ্ছে চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে। তাঁরা মনে করেন যে, নতুন ধরনের সর্বহারা রাষ্ট্রের বিকাশের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন কমরেড মাও। রাষ্ট্রের কাজকর্ম চালানোর ক্ষেত্রে পার্টি-বহির্ভূত জনগণ দিয়ে তৈরি বিপ্লবী কমিটি গঠনের উপর খুব গুরুত্ব দেন তাঁরা। ২০০৩ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সিদ্ধান্ত বিতর্কের জন্য জনগণের মধ্যে রাখা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল: “একটি নির্দিষ্ট স্থান, কাল ও অবস্থায় যে পার্টি সর্বহারা বিপ্লবী, বা যে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক, অন্য এক স্থান, কাল বা অবস্থায় তা হয়ে উঠতে পারে প্রতি-বিপ্লবী। মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শিক্ষা, অর্থাৎ এরকম একটা অবস্থায় বিপ্লবীদের যে বিদ্রোহ

করতে হবে, সেটি অবশ্যই সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু ধরে নেওয়া হয় যেন কোনো একটি কমিউনিস্ট পার্টি সর্বহারা পার্টিই থেকে যায়, সে পার্টির নেতৃত্বে যদি নয়াগণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে পার্টির বিরুদ্ধে জনগণের মুক্ত গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা করার হয় কোনো সুযোগ থাকে না, বা তার প্রস্তুতি থাকে না, বা তা করা নিষিদ্ধ হয়।”

ওই প্রস্তাবেই জোর দেওয়া হয়েছে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা সংগঠিত করে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করার ওপর, যার ফলে কমিউনিস্ট পার্টিতে ক্রমাগত সর্বহারাকরণ ও বিপ্লবীকরণ ঘটেই চলে। পার্টি যদি ক্রমাগত নিজের বিপ্লবীকরণ করতে ব্যর্থ হয়, জনগণের এমন ক্ষমতা থাকতে হবে যাতে তারা একটি বিকল্প বিপ্লবী পার্টি বা নেতৃত্বকে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে বসাতে পারে। এইসব পার্টিগুলির মধ্যে যান্ত্রিক বা আনুষ্ঠানিক সহযোগিতা থাকা উচিত নয়, যেমনটা ছিল চীনে। জনগণের সেবায় এগুলোর মধ্যে থাকা উচিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। এই প্রশ্নে নেপালের কমরেডরা এত ঐকান্তিক যে তারা এক-পার্টির আধিপত্য মেনে নেবার বদলে বরং বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার বিপদকেও মেনে নেবেন। ২০০৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে সিপিএন(এম)-এর পেশ করা প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁদের গভীর বিশ্বাসের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে: “এতদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ নয়, পার্টির ভেতরকার অধঃপতনই বেশির ভাগ সর্বহারা বিপ্লবে অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছে। তবে সেই বিপদও অবশ্য রয়েই গেছে। কিন্তু আমরা মনে করি যে পার্টির সংশোধনবাদে পতিত হওয়ার তুলনায় এটি (সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ) কম বিপজ্জনক।”

শ্রেণীর একনায়কত্ব ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়টির উপর তারা যে বিশেষ নজর দেন, রাষ্ট্র নিয়ে সিপিএন(এম)-এর চিন্তার মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাদের মতে, এক শ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর ‘ইচ্ছা’ বা ‘একনায়কত্ব’ জোর করে চাপানোই যেহেতু রাষ্ট্রের আক্ষরিক অর্থ, ইতিহাসের শেষ শ্রেণী অর্থাৎ সর্বহারাদের প্রত্যক্ষ একনায়কত্ব ছাড়া মার্কসবাদী অর্থে কোনো ‘নতুন রাষ্ট্র’ তৈরি হতে পারে না। কিন্তু শ্রেণীটি কেমন করে একনায়কত্ব বজায় রাখবে? সিপিএন(এম) বিশ্বাস করে যে, সর্বহারার একনায়কত্বের অর্থ পার্টির বা তার উচ্চতর নেতৃত্বের একনায়কত্ব নয়, এর অর্থ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠানের (যেমন, সোভিয়েত বা পিপলস কাউন্সিল) মাধ্যমে শ্রেণীর একনায়কত্ব। তারা মনে করে, কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে ফারাক প্রায় ঘুচিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সর্বত্র ভয়ানক ভুল করা হয়েছে। এই ভুল শোধরানোর জন্য আজকের কমিউনিস্টদের তাই সাহস দেখাতে হবে। অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিন ক্রমাগত যে ব্যাপারটার ওপর জোর দিয়েছেন যে, সর্বহারা একনায়কত্বের প্রয়োগ ঘটাতে হবে সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে— সেই শিক্ষাকে তুলে ধরতে হবে। এটি ভারতের কমিউনিস্টদের পক্ষেও একটি প্রধান শিক্ষা হতে পারে।

## পার্টি প্রশ্নে

কমিউনিস্ট পার্টিগুলি, এমনকি আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতাদের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও যে সংশোধনবাদী পার্টিতে অধঃপতিত হচ্ছে, এই ঐতিহাসিক প্রবণতাটি সিপিএন(এম)-এর কমরেডদের কাছে একটি বিরাট দুশ্চিন্তার বিষয়। কোনো বিশেষ নেতার বিশ্বাসঘাতকতা বা অধঃপতনকে এর কারণ হিসাবে দেখিয়ে বিষয়টির অতিসরলীকরণ, যেটি আমরা, ভারতের কমিউনিস্টরা প্রায়শই করে থাকি, সেটি করতে চান না তাঁরা। এই অধঃপতনের পেছনে প্রধান কারণ হিসাবে তাঁরা বরং জোর দেন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে ভুল বা একপেশে ভাবে বোঝার ওপর, জনগণ থেকে পার্টির বিচ্ছিন্নতার ওপর। তাঁরা মনে করেন, কোনো কোনো সময় কেন্দ্রিকতার ওপর জোর দেওয়ার ঐতিহাসিক ‘প্রয়োজন’ হতে পারে, কিন্তু এই তাৎক্ষণিক প্রয়োজনকে সর্বজনীন নীতি বানানোটা ভুল। কমিনটার্নের সময়ে এটিই ঘটেছিল, আর তার ফলে গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার মধ্যেকার সম্পর্কটি হয়ে ওঠে আধিবিদ্যক। তাঁরা মনে করেন সঠিক কেন্দ্রিকতা অর্জনের জন্য উচ্চমাত্রার গণতন্ত্র প্রয়োজন— যা ছাড়া সমাজতন্ত্র স্থাপন করা যায় না। এ ব্যাপারে তাঁরা যে আন্তরিক তা বোঝা যায় তাঁদের নিয়মিত বর্ধিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বান করা থেকে। এই সভাগুলিতে হাজারে হাজারে মানুষ উপস্থিত থাকেন। সিপিএন(এম) মনে করে যে, (বিভিন্ন দেশে) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অনুশীলনে বড় ধরনের ভুল করার ফলেই জনগণ থেকে পার্টির বিচ্ছিন্নতা এসেছে। মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে নেপালের কমরেডরা মনে করেন যে, আজকের কমিউনিস্টদের উচিত পার্টির উচ্চতম নেতৃত্বের প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য পার্টি কর্মী ও জনগণের উদ্যম বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায়কে প্রাতিষ্ঠানিকতা দিয়ে নতুন পার্টি গঠন করা। এই বিদ্রোহ এতদূর পর্যন্ত এগোতে পারে যাতে পার্টি-সদস্যদের পার্টি থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পার্টির ‘ভেতর’ আর ‘বাহির’-এর মধ্যেকার ফারাক ঘুচিয়ে দেওয়া উচিত। তারা তাদের এই বিশ্বাসের সমর্থনে মাওয়ের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। “‘ভেতর’ আর ‘বাহির’-এর মধ্যে ফারাকের অজুহাত তোলার অর্থ হল বিপ্লবকে ভয় পাওয়া।” (স্টুয়ার্ট শ্রাম, *মাও সে তুঙ আনরিহার্সড*, পৃ. ২৫৪) বাইরে থেকে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর ক্রমাগত নজরদারি, সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় তখনই যখন পার্টি একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ না করে, বহুদলীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়। কমিউনিস্ট পার্টি যদি সর্বহারা চরিত্র হারায় তবে নির্বাচনের মাধ্যমে সেই পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এসব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছাড়াও, এই নতুন ধরনের পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত ধারণার গভীরতার বৃদ্ধির জন্য সচেতনতার ভূমিকার ওপর জোর দেয় সিপিএন(এম)। তারা বিশ্বাস করে যে, ‘অনিবার্যতা’কে সঠিকভাবে বোঝা ও ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে অনিবার্যতাকে ‘স্বাধীনতা’য় পরিণত করাই হওয়া উচিত সচেতনতার সারমর্ম। পার্টির প্রতিটি কমরেডদের মধ্যে এই সচেতনতা আনা দরকার। ওপরের দিকের কয়েকজন মাত্র মতাদর্শগতভাবে সক্রিয় আর বাকি কর্মীরা অসহায় দর্শকমাত্র, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে অক্ষম— কমিনটার্ন মডেলের পুরনো পার্টিগুলির এই অনুশীলনের অবসান ঘটানো দরকার। নতুন ধরনের পার্টিতে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে প্রতিটি পার্টি কর্মীই নিজেকে এমনভাবে বিকশিত করতে পারেন যাতে তাঁরা দ্বান্দ্বিকভাবে বুঝতে ও সে অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হতে পারেন।

## জনযুদ্ধের লাইনটির সৃষ্টিশীল প্রয়োগ

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নির্দিষ্ট অবস্থা বিচার করে সিপিএন(এম) একটি জনযুদ্ধের লাইন নির্মাণ করেছে যেটি চীনের দীর্ঘায়ত জনযুদ্ধ বা রাশিয়ার অভ্যুত্থান, কোনোটির সঙ্গেই ঠিক মেলে না। পার্টি একে বলেছে দুটির সংমিশ্রণ। কিন্তু সংমিশ্রণের অর্থ এই দুটি ভিন্ন রণনীতিগত ও রণকৌশলগত

লাইনের যান্ত্রিক মিশ্রণ নয়। এর অর্থ হল নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী যখন যে লাইনটি উপযুক্ত হবে সেটি ব্যবহার করা। মনে করা যেতে পারে যে, এই জনযুদ্ধের শুরু হয়েছিল অভ্যুত্থান দিয়ে,যখন একই সঙ্গে ৫ হাজার অ্যাকশন ঘটানো হয়েছিল। তৎকালীন পরিস্থিতিতে বাস্তব চাহিদা ছিল এরকম একটি জিনিস করার, আর সেটি চেহারা নেয় অভ্যুত্থানের। এর সাফল্যের পর শুরু হয় পরিকল্পিত গেরিলা যুদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের সঙ্গে যার মিল আছে। "অভ্যুত্থানের ধরনে সূচনা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ীভাবে চলতে থাকা নেপালের জনযুদ্ধের বিশেষত্ব।" (*দি ওয়ার্কার*, সংখ্যা ১১) কোনো একটি বিশেষ মডেলের কাঠামোয় আটকে থাকা নয়, ক্রমাগত বিকশিত হওয়া, পুরনো ধরনটিকে পাল্টে ফেলা মার্কসবাদী মতাদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। নেপালের মাওবাদীরা তাঁদের কাজকর্মের বিভিন্ন জায়গায় এই পথ অনুসরণ করেছেন, আর এটাই তাদের শক্তি, সজীবতা ও ক্ষমতার উৎস।

**সীমাবদ্ধতা**

যে পার্টিটি তাদের নিজেদের দেশের বাস্তবতার বিচারের ক্ষেত্রে এমন গভীরভাবে বস্তুনিষ্ঠ, সে পার্টিটিই যখন দারুন আত্মমুখিনতায় নিমগ্ন হয়ে ঘোষণা করে যে প্রতিটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক দেশই (ভারত সহ) সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করার জন্য প্রস্তুত, তখন সেটাকে যেন স্ববিরোধী মনে হয়। ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশের স্তর ও শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশ সংসদ সহ শক্তিশালী পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্ম দিয়েছে। অথচ এরকম একটি দেশে বিপ্লবী দিশায় শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করার কাজটা ভালভাবে শুরুও হয়নি। রাশিয়ার কথা বাদই দিলাম, চীনেও সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচি হাতে নেওয়ার আগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই কাজটি করে ফেলেছিল। পুরো দক্ষিণ এশিয়াকেই জনযুদ্ধের রণভূমি মনে করে সিপিএন(এম)। তারা মনে করে যে, দক্ষিণ এশিয়ার যে-কোনো একটি দেশ বা দেশের একাংশের মুক্তি এই এলাকার অন্য দেশগুলিতে জনযুদ্ধ চালানোর ক্ষেত্রে ঘাঁটি হিসাবে কাজ করবে। হয়তো সেকারণেই কমপোসা (CCOMPOSA) বা সাউথ এশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেশনের প্রয়োজনের ওপর এত গুরুত্ব দেয় তারা। বিভিন্ন দেশের অবস্থাকে এরকম একভাবে বিচার করাটা এক ধরনের যান্ত্রিকতা। বিশেষত এটা যখন আসে সিপিএন(এম)-এর মতো একটি কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে, নিজেদের দেশের ক্ষেত্রে যাদের ধারণা অনুকরণযোগ্যভাবে মার্কসবাদী, তাদের কথাটা একটা গুরুত্ব পেয়ে যায়। ফলে অন্য দেশের কমরেডরা তাদের এই ধারণার ভিত্তিতেই কর্মসূচি নির্ধারণ করে ফেলতে পারেন, যদিও তা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। এর ফলে দারুন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

নেপালের কমরেডদের আর একটা দুর্বলতা চিন্তার বিষয়। তাদের দেশে শিল্প শ্রমিকদের প্রায় অনুপস্থিতি নিয়ে তাদের বিশেষ চিন্তার অভাবটাই এই দুশ্চিন্তার কারণ। নেপালের শ্রমজীবী মানুষের মাত্র ১·২৫ শতাংশ শিল্প শ্রমিক। সারা বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাবই মার্কসবাদ আবিষ্কারের বাস্তব ভিত্তি রচনা করেছে। রাশিয়ার ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে অন্তত প্রথম দিকে সর্বহারাদের মধ্যে কাজের উপর গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করেই তাদের মতাদর্শগত অভিমুখ রচনা করেছিল সেকথা এখন ইতিহাস। কোনো একটি বিশেষ সমাজে এই শ্রেণীটির খুব দুর্বল উপস্থিতি তাই মার্কসবাদী চিন্তাভাবনার উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য সে সব দেশে কমিউনিস্ট পার্টি থাকবে না বা বিপ্লব সম্ভব হবে না, তা নয়। কিন্তু এই সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন, ভালভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন, এই দুর্বল বাস্তব ভিত্তির উপর কীভাবে কমিউনিস্ট মতাদর্শ নির্মাণ করা যাবে সেই সমস্যার সমাধানকল্পে বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। এটা এখন প্রায় সবারই জানা যে, পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে যে বুর্জোয়ারা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই ক্ষমতা দখল করতে পারলো তার একটা প্রধান কারণ সর্বহারা শ্রেণী থেকে পার্টির বিচ্ছিন্নতা। নিজেদের ভুল নীতির কারণে এই পার্টিগুলি সর্বহারা শ্রেণীকে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল আর তার ফলে তারা শ্রেণী থেকে টিকে থাকার রসদ সংগ্রহ করতে পারেনি। ওই পার্টিগুলি হয়ে পড়ে বুর্জোয়া মতাদর্শের সূতিকাগার। কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক মতাদর্শের বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেকারণে, তাদের দেশে শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যার দিক দিয়ে খুব কম হওয়ার ব্যাপারটা গভীর মনোযোগের বিষয়, কিন্তু নেপালের কমরেডরা ব্যাপারটার উপর তেমন গুরুত্ব দেন না।

মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সিপিএন(এম) ভয়ানক একপেশে। একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদের পুনরুত্থান আটকানোর একটা মহান প্রচেষ্টা হিসাবে ইতিহাসে এর নাম থাকবে। কিন্তু তার সঙ্গে এটি যে সেই প্রচেষ্টায় সফল হয়নি সেই দুঃখজনক বাস্তবতাটিকেও কি আমাদের হিসাবে আনা দরকার নয়? আমাদের কি এই ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত নয়, যাতে করে ভবিষ্যতের জন্য আমরা শিক্ষা পেতে পারি? এই সব প্রশ্নে সিপিএন(এম)-এর কমরেডরা উদাসীন। নেতিবাচক শিক্ষাগুলি সম্পর্কে যত্নবান না হলে কোনো ইতিবাচক শিক্ষা পাব না আমরা।

মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কিছু গুরুতর দুর্বলতা ছিল যার ফলে পার্টির মধ্যেকার পুঁজিবাদী পথযাত্রীরা বিশেষ প্রতিরোধ ছাড়াই পার্টির ক্ষমতা দখল করে নেয়। এটা কি সত্যি নয় যে এই পুঁজিবাদী পথযাত্রীদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে পার্টি কমিটি ব্যবস্থা ধ্বংস করার ফলে দেশ জুড়ে দারুন নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়? যে অরাজকতা দেখা দেয় তা সংশোধনবাদীদের নিজেদের ক্ষমতা সংহত করার ও লিন বিওয়ায়ের মতো অতি-সুবিধাবাদীদের ষড়যন্ত্র করার সুযোগ করে দেয়? এই অবস্থা সিপিসি-র নবম কংগ্রেসে 'নতুন যুগ'-এর তত্ত্ব ও 'উত্তরাধিকারী' স্থির করার মতো বিরাট বিরাট ভুলের পথ করে দেয়। পুঁজিবাদী পথযাত্রীরা মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বদনাম করার কাজে এইগুলিকে ব্যবহার করে এবং ক্ষমতায় আসে। মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব নামটির মধ্যেই বলা আছে খুব গভীর এক তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রয়োজনীয়তার কথা। মানুষের সচেতনতার ক্ষেত্রে এক সর্বাঙ্গীন বিপ্লবের ধারণা নিহিত আছে এই নামটির মধ্যে। খুব কম সময়ের মধ্যে পুঁজিবাদী পথযাত্রীরা যে সহজ বিজয় অর্জন করলো তার থেকে বোঝা যায় যে মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব এই কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই কঠিন সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত আমাদের। মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব কোনো সর্বরোগহর ওষুধ নয়, যদিও এর থেকে অনেক মহান শিক্ষা আমরা নিতে পারি। কিন্তু সিপিএন(এম) কোনো সমালোচনা ছাড়াই এর সমর্থক। মাও সেতুঙ চিন্তাধারার বদলে 'মাওবাদ' ব্যবহারের পেছনে তাদের যুক্তিও খুব দুর্বল। মার্কসবাদী তত্ত্বে মাও যে গুণগত বিকাশ ঘটিয়েছেন সেটা প্রমাণ করার জন্য যে কথাগুলি তারা বলে থাকেন সেগুলো খুব জোরালো নয়। তাদের দার্শনিক লেখাপত্রও প্রত্যাশা পূরণ করে না।

পাঠক হয়তো বুঝবেন যে সিপিএন(এম)-এর কমরেডদের যে সমালোচনা করছি সেটা করছি তাদের সম্বন্ধে আমাদের দারুন উঁচু ধারণার কারণেই। বর্তমানে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে তারাই সবচেয়ে সার্থক। সে কারণে তাদের দুর্বলতাগুলো আমাদের সবচেয়ে বেদনাদায়ক

মনে হয়। এই চিন্তা থেকেই আমরা আশা করি যে মার্কসবাদের মতাদর্শের বিরোধী যা কিছু তার বিরুদ্ধে তারা শেষ অবধি সংগ্রাম করবেন। আমাদের প্রিয় নেপালের কমরেডরা অজানা পর্বতশিখরে আরোহণের সাহস দেখিয়েছেন। তারা নিশ্চয় মতাদর্শগত ও তাত্ত্বিক প্রশ্নের সমস্ত দিকেই এই সাহস দেখাবেন।

# নেপালের বিপ্লবী আন্দোলন কোন্ পথে

বিশ্বজিৎ হাজরা

গোটা পৃথিবীর কম্যুনিষ্ট আন্দোলন-ই আজ যখন এক বদ্ধ দশার মধ্যে দিয়ে চলেছে, তখন, নানান কারণেই, CPN(M)-এর নেতৃত্বে নেপালের সাম্প্রতিক পটপরিবর্তন সংবাদের শিরোনামে। এই পটপরিবর্তন এখনও চলমান। প্রায় প্রতিদিনই সে দেশে এমন সব পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে, যা আগের দিনের চেয়ে পৃথক। আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি, CPN(M)-ও (সদ্যসমাপ্ত ঐক্য সম্মেলনের পর যার নতুন নামকরণ হয়েছে UCPN(M)) বাধ্য হচ্ছে অতি দ্রুত তাদের রণকৌশল পরিবর্তন করতে; নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন অবস্থান গ্রহণ করতে। এমতাবস্থায়, খুব স্বাভাবিকভাবেই, সারা বিশ্বের কম্যুনিষ্ট শিবিরের মনোযোগের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে নেপাল। উচ্চস্তরের শ্রেণিসংগ্রামের এমন একটি জীবন্ত পরীক্ষাগারকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ ইতিহাসে কমই আসে। পরিণতি শেষ পর্যন্ত যাই ঘটুক না কেন, বিগত এক দশককে ধরে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত CPN(M)-গৃহীত রণনীতি ও নিয়ত পরিবর্তনশীল রণকৌশল, এবং সেই দিশায় পরিচালিত হওয়া নেপালী জনতার আন্দোলনের নানান আঁক-বাঁক ও মোড়, নিশ্চিতভাবেই পৃথিবীর প্রতিটি কম্যুনিষ্ট সংগঠনের কাছে একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। এবং তা থাকবে মূলতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ, একই সঙ্গে প্রায় আড়াইশো বছরের শক্তিশালী রাজতন্ত্র তথা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো, আমলাতান্ত্রিক বৃহৎ-পুঁজি এবং পৃথিবীর একনম্বর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এমন একটি সাধারণ মৃগয়াক্ষেত্রের উদাহরণ বর্তমান বিশ্বে কমই আছে। তদুপরি উত্তরে চীন ও দক্ষিণে ভারতের মত এশিয়ার দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের সম্প্রসারণবাদী উপস্থিতির কথা ধরলে তো এমন উদাহরণ বিরলতম। ফলে বাহ্যিক রূপের বিচারে নেপালের মেহনতি মানুষের এতদিনের সংগ্রাম মূলতঃ 'রাজতন্ত্র বিরোধী' তথা 'সামন্ততন্ত্র বিরোধী' হলেও, অন্তর্বস্তুতে তা একই সঙ্গে রাজপরিবারের আমলাতান্ত্রিক পুঁজি ও তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদী (মূলতঃ মার্কিন) পুঁজি এবং ভারত রাষ্ট্রের দ্রুত বিকাশমান আগ্রাসী বৃহৎ পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষরত। এই তিন মহাশক্তিধর শত্রুর নিজেদের মধ্যে যেমন স্বার্থের কিছু দ্বন্দ্ব রয়েছে, তেমনি, নেপালী জনতার ওপর যুগ-যুগান্তরের শোষণকে আরও তীব্রতর করার প্রশ্নে এবং গণআন্দোলনের যে কোন উত্থানকে নির্মমভাবে দমন করার প্রশ্নে এরা আবার একজোটও বটে। CPN(M) অনুসৃত রণনীতি এবং রণকৌশল, কিভাবে এই শত্রুত্রয়ের দ্বন্দ্বগুলিকে কাজে লাগাবে এবং একই সঙ্গে কিভাবেই বা তাদের সম্মিলিত ও সাধারণ স্বার্থের বিরুদ্ধে নেপালী মেহনতি জনতার লড়াইকে পরিচালনা করবে—নিঃসন্দেহে তা একটি গভীর পর্যবেক্ষণের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজতন্ত্রের অপসারণের পর (যদিও নেপালের আর্থসামাজিক কাঠামোয় সামন্ততান্ত্রিক উপাদান এখনও বহুলাংশেই বর্তমান), প্রজাতান্ত্রিক নেপালে, সামন্তবাদ-বৃহৎপুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে নেপালী শ্রমিকশ্রেণি তথা মেহনতী জনতার রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা কিভাবে একই রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন থাকতে পারে, তা-ও বিশেষভাবে একটি নিরীক্ষার বিষয়বস্তু। ১৯১৭ সালের রাশিয়ায়, 'সাময়িক বিপ্লবী সরকার' গঠন করে সংবিধান সভা আহ্বান করার যে স্লোগান বলশেভিকরা হাজির করেছিল, নেপালের বর্তমান সরকার চরিত্রগতভাবে তার থেকে ভিন্ন। আবার চীন দেশে CPC-র নেতৃত্বে 'শ্রমিক-কৃষকের একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যে 'নয়াগণতান্ত্রিক সরকার' গঠন হয়েছিল, তার সঙ্গেও নেপালের ঢের অমিল। CPN(M) নেতৃত্ব তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্য, লেখালেখিতেও নেপালের বর্তমান পর্যায়কে নয়াগণতন্ত্র-পূর্ব একটি 'উৎক্রান্তিকালীন' পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করছেন।* এই ধরণের একটি রাষ্ট্রব্যবস্থায়, ঘোষিতভাবেই পুঁজিবাদের পথের পথিকদের সঙ্গে (যেমন নেপাল কংগ্রেস বা ইউ.এম.এল.; সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতেও যাদের দ্বিধা নেই, আবার সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে প্রয়োজনে সমঝোতা করতেও আপত্তি নেই) রাষ্ট্রক্ষমতা আপাতভাবে ভাগ করে নেওয়ার, এবং নয়াগণতন্ত্র তথা তৎপরবর্তী সমাজতন্ত্রের অভিমুখে তাকে চালিত করার কোনও প্রয়াস, অভিজ্ঞতা আকারেই বেশ নতুন; বিশ্বপুঁজির রমরমার যুগে যা রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং-ও বটে। নিশ্চিতভাবেই দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণিঅবস্থানকে এই 'উৎক্রান্তিকালীন' সরকার তথা রাষ্ট্রকাঠামো দীর্ঘদিন ধরে লালন করে চলবে না; জিতবে যে কোন একটি-ই। কোন্‌টি জিতবে এবং কিভাবে—সে সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যতবাণী করতে যাওয়াটা অর্থহীন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল এই দীর্ঘ যাত্রাপথে এখনও পর্যন্ত CPN(M) গৃহীত রণনীতি ও রণকৌশলগত অবস্থানগুলিকে খুঁটিয়ে বিচার করার চেষ্টা করবো, দেশ বিদেশের অতীত বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের দিকগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো, এবং সর্বোপরি, অদূর ভবিষ্যতে যে দ্বন্দ্বগুলি নেপালী সমাজের শ্রেণিসংগ্রামে তীব্র হয়ে উঠতে চলেছে, তার একটি আগাম রূপরেখা হাজির করার চেষ্টা করবো।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা '৯০ পরবর্তী নেপালে গণআন্দোলনের ধারা ও তাতে মাওবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকাকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নেবো—১) সংবিধান পরিষদ নির্বাচন পূর্ববর্তী পর্যায়; এবং ২) নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়। নানান উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে প্রথম পর্যায়টি দশ-বারো মাস আগে পরিণতি পেয়েছে; দ্বিতীয় পর্যায়টি সবে শুরু হয়েছে বলা চলে। সময়ের বিচারে পর্যায়দুটির মধ্যে দূরত্ব সামান্য কয়েক মাসের হলেও একটি কম্যুনিষ্ট পার্টি হিসাবে CPN(M)-এর রণনীতি ও রণকৌশলগত পদক্ষেপগুলিকে অনুশীলনে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে এই দুটি পর্যায়ের মধ্যে ব্যবধান কয়েক যোজনেরও বেশি। প্রথম পর্যায়ে 'রাজতন্ত্রের অবসান'-এর স্লোগানকে মুখ্য অ্যাজেণ্ডা করে CPN(M) রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রামে নেপালের মেহনতী জনতাকে নেতৃত্ব দিয়েছে; দ্বিতীয় পর্যায়ে 'নতুন গণতান্ত্রিক নেপাল' গড়ার কর্মসূচীকে সামনে রেখে নিজেই রাষ্ট্রযন্ত্রের শরিক হয়েছে। এই দুটি পৃথক পর্যায়ে একটি কম্যুনিষ্ট পার্টি হিসাবে CPN(M)-এর ভূমিকাই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু।

### নির্বাচন পূর্ববর্তী পর্যায়:

বিগত শতাব্দীর '৯০ দশক থেকে শুরু করে ২০০৮ সালের ১০ এপ্রিল পর্যন্ত, প্রায় দু'দশক ব্যাপী বিস্তৃত এই সময়পর্বে নানান আঁক-বাঁকের মধ্যে দিয়ে নেপালের শ্রেণিসংগ্রাম এগিয়েছে; CPN(M)-ও তার সর্বশক্তি দিয়ে এই শ্রেণিসংগ্রামের অভিমুখকে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছে। CPN(M)-এর এই পর্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থান তথা কর্মকাণ্ডগুলিকে আমরা মূলতঃ তিনটি উপপর্বে ভাগ করে নিতে পারি— ক) '৯০-'৯১

থেকে '৯৬ পর্যন্ত মূলতঃ গণআন্দোলনের পর্ব, একক এবং যৌথ প্রচেষ্টায় রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে নেপালী জনতাকে সমাবেশিত করার প্রয়াস-পর্ব এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ; খ) '৯৬ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক জনযুদ্ধের দশ বছর, যে সময়ে পার্টি তার সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করেছে রাজতন্ত্র ও তার অনুসারী গ্রামাঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে লাগাতার সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে তথা দেশব্যাপী বিকল্প ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে; গ) ২০০৬ পরবর্তীতে জনযুদ্ধের পথ থেকে সরে এসে পুনরায় প্রকাশ্য গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ, এপ্রিল গণআন্দোলনে নেতৃত্বদান এবং আরও পরে সাতপার্টি জোটের সঙ্গে নির্দিষ্ট শর্তের সাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে অংশগ্রহণ। গুরুত্বের বিচারে এই তিনটি উপপর্বের প্রতিটিই পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বর্তমান প্রবন্ধে সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সুযোগ না থাকায় আমরা কেবল উপপর্বগুলির মূল মূল চরিত্রগত বৈশিষ্টগুলিকেই একবার ছুঁয়ে যাব।

প্রথম উপপর্বটি ছিল চারের দশক থেকে চলে আসা নেপালী কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের দীর্ঘকালব্যাপী স্থবিরতাকে সজোরে ধাক্কা দেওয়ার পর্ব; 'প্রাতিষ্ঠানিক কম্যুনিষ্ট' আন্দোলনের তৎকালীন ধরা-বাঁধা, রুটিনমাফিক, প্রথাগত কাজের ধারাকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রকৃত বিপ্লবকামী কম্যুনিষ্টদের একটি আধারে ঐক্যবদ্ধ করে দেশে একটি বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলার পর্ব। '৯০ দশকের সূচনাপর্বে রাজতন্ত্র বিরোধী এক তুমুল গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সেই প্রথম দেশে একটি বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট পার্টির অভাব অনুভূত হয়, যে পার্টি নেপালের মেহনতী মানুষের রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম, একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি অভিমুখে তাকে পরিচালনা করতে সক্ষম। সমাজ বিপ্লবের অবজেকটিভ শর্তাবলী প্রায় প্রস্তুত, অথচ সাবজেকটিভ প্রস্তুতি নিতান্তই অপ্রতুল—এমনই এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে CPN(M)-এর বর্তমান নেতৃত্বের একাংশ নেপালী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুবিধাবাদী, সংস্কারপন্থী ও আপষকামী পার্টি নেতৃত্ব থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেপালের তৎকালীন কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অগ্রণী অংশটি '৯১ সালে ঐক্যবদ্ধ হয় CPN(UC) নামক সংগঠনে—যা পরবর্তীতে নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত হয় বর্তমানের CPN(M) [অধুনা UCPN(M)] সংগঠনে। '৯১-এর ঐক্য কংগ্রেসেই পার্টির বৈপ্লবিক আদর্শের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে 'মাওবাদ'-কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, বিপ্লবের সাধারণ পথ হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পথকে গ্রহণ করার শপথ নেওয়া হয়। কিন্তু সশস্ত্র জনযুদ্ধের পথকে হাতে কলমে অনুশীলন করার মত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও জনসমর্থন যে তখনি অর্জিত হয়নি, তৎকালীন পার্টি নেতৃত্ব সে কথাও সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেন। ফলে '৯১ থেকে '৯৬-এর শুরুর সময় পর্যন্ত, পার্টি মূলতঃ জোর দেয় আইনী ও প্রকাশ্য গণআন্দোলনের রূপের ওপর। একদিকে রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ শক্তিকে সমাবেশিত করে যৌথ আন্দোলনে অংশগ্রহণ, নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদে যোগদান, অন্যদিকে, পার্টির একান্ত নিজস্ব কর্মসূচী হিসাবে আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ—এই দুটি কাজকেই অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে এই পর্বে সমন্বিত করেন তৎকালীন পার্টি নেতৃত্ব।

দ্বিতীয় উপপর্বটির শুরু ১৯৯৬ সালের ১৩ ই ফেব্রুয়ারি, আনুষ্ঠানিকভাবে যেদিন থেকে দেশজোড়া সশস্ত্র জনযুদ্ধের ডাক দেওয়া হয়। '৯৬ থেকে ২০০৬, দীর্ঘ দশ বছর ব্যাপী এই সশস্ত্র সংগ্রামে প্রায় সমগ্র নেপাল জুড়েই নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় CPN(M)। দেশের ৭৫টি জেলার মধ্যে কমবেশী ৬৮টি জেলায় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁরা সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তোলেন। গড়ে তোলেন প্রায় ২০ হাজার সশস্ত্র সদস্য বিশিষ্ট এক বিশাল 'পিপলস্ লিবারেশান আর্মি'—রাজতন্ত্রের আজ্ঞাবাহী 'রয়্যাল নেপাল আর্মি'-কে যা প্রতিদিনই কঠিনতর চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে থাকে। এই উপপর্বে, রাজতন্ত্র বিরোধী তথা সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামকে নিছক কাগুজে কর্মসূচীতে আবদ্ধ না রেখে কঠিন বাস্তবের মাটিতে সাফল্যের সাথে তাকে প্রয়োগে নিয়ে যেতে সমর্থ হয় পার্টি। ১০ বছর ধরে হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মী তাঁদের জীবন দানের বিনিময়ে নেপালী জনতার কাছে CPN(M)-এর রাজতন্ত্র বিরোধী ভাবমূর্তিকে এক অসাধারণ উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়; নেপাল কংগ্রেস বা UML-এর আনুষ্ঠানিক রাজতন্ত্র বিরোধিতার সঙ্গে CPN(M)-এর রাজতন্ত্র বিরোধী কর্মসূচীর যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, মানুষের কাছে তর্কাতীতভাবে সেই সত্য প্রতিষ্ঠা পায়। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে শোধনবাদ, সংস্কারবাদ ও সংসদসর্বস্বতার রমরমার যুগে সারাবিশ্বের বিপ্লবকামী মানুষের কাছেও CPN(M) আরও একবার এই মৌলিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সত্যকে সজোরে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় যে, উচ্চতর স্তরে আরোহন করলে শ্রেণি সংগ্রামের সশস্ত্র রূপ পরিগ্রহ না করে অন্য কোনও উপায় নেই—প্রকাশ্য, আইনী অথবা সংসদীয় সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রামের পরিপূরক হতে পারে, কিন্তু কখনোই তার বিকল্প নয়।

তৃতীয় উপপর্বটির শুরু ২০০৫-০৬ সালে। সশস্ত্র জনযুদ্ধের সাফল্যের চূড়ায় থাকতে থাকতেই CPN(M) ক্রমশঃ এই পথ থেকে সরে আসে। রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সংসদীয় পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে শুরু হয় আলাপ আলোচনা পর্ব। এই পর্যায়ে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্রের ঘোষণার দাবিতে, নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ওপর ভিত্তি করে, নেপালের সাতটি রাজনৈতিক দলের জোটের সঙ্গে যৌথভাবে এক ব্যাপক ও প্রকাশ্য গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করে CPN(M), যা এপ্রিল গণআন্দোলন-২ নামে নেপালের ইতিহাসে স্থায়ীভাবে নিজের জায়গা করে নেয়। প্রবল গণআন্দোলনের চাপে অবশেষে পিছু হটে রাজতন্ত্র। কংগ্রেস নেতা গিরিজাপ্রসাদ কৈরালার নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। CPN(M) সেই সরকারে শর্তসাপেক্ষে যোগদানও করে। কিন্তু আপসকামী এই সরকার পিছনের দরজা দিয়ে রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার অপচেষ্টা ক্রমাগত জারী রেখে যাওয়ায় এবং কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নির্বাচন নিয়ে ক্রমাগত টালবাহানা চালাতে থাকায় একসময় CPN(M) সরকার ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পরবর্তীতে নির্বাচন আহ্বান করা সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রতিশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে পুনরায় সরকারে যোগ দেয় CPN(M)। ১০ই এপ্রিল নেপালের বুকে সম্পন্ন হয় বহুপ্রতিক্ষিত অ্যাসেম্বলি নির্বাচন। ভোট গণনার পর একক বৃহত্তম দল হিসাবে নির্বাচিত হয় CPN(M); নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস ও UML-এর সম্মিলিত আসনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুন আসনে জিতে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাবের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ নেপালের বুকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় মাওবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি।

এই তিনটি উপপর্বের প্রথম দুটিতে CPN(M) তাত্ত্বিক ও আদর্শগত প্রশ্নে বেশ কিছু নতুনতর অবস্থান গ্রহণ করে। 'মাওবাদ', 'প্রচণ্ডপথ' সম্পর্কে তাঁদের গৃহীত অবস্থানের পাশাপাশি 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব', 'সমাজতন্ত্রের সঙ্কট' প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে CPN(M) -এর বেশ কিছু বিশ্লেষণ সমকালীন মার্কসবাদী মহলে নানা বিতর্কের জন্ম দেয়। কিন্তু তৃতীয় উপপর্বে, এই সমস্ত বিতর্ককে ছাপিয়ে গিয়ে সামনে চলে আসে নেপালের তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অথবা না যাওয়া সংক্রান্ত বিতর্কটি। ১৯৯৬ থেকে ২০০৬, দীর্ঘ দশ বছর সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ পরিচালনা করার পর এমন একটি সময়ে CPN(M) সেই পথ থেকে সরে আসে, যখন তাঁরাই মূলতঃ চালকের আসনে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই, সারা পৃথিবীর কম্যুনিষ্ট বিপ্লবী শিবিরে CPN(M) -এর এই পদক্ষেপকে নিয়ে দুটি মতামত গড়ে ওঠে—একটি

মত অনুযায়ী, রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামকে তথা সামগ্রিক বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নেপালের তৎকালীন পরিস্থিতিতে মাওবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি সঠিক অবস্থানই গ্রহণ করেছে; অন্য মতটি হল, সশস্ত্র সংগ্রামের পথ থেকে সরে আসাটা CPN(M)-এর দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিরই নামান্তর। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে নিজেদের অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করলেও, ভারতের মাওবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সমমনোভাবপন্ন বেশ কিছু সংগঠন সে'সময় মূলতঃ দ্বিতীয় অবস্থানটির-ই পক্ষে দাঁড়ায়। নেপালের মত একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দূরায়ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে সশস্ত্র সংগ্রাম ও প্রকাশ্য গণআন্দোলনের আন্তঃসম্পর্ককে সঠিকভাবে নির্ণয় করার কাজটি নির্দিষ্টভাবে কেবল নেপালের জন্যই নয়, সাধারণভাবে দক্ষিণ এশিয়ার কাছাকাছি চরিত্র সম্পন্ন অন্যান্য দেশগুলির জন্যও প্রয়োজনীয়। কাজেই এই প্রসঙ্গে তৈরী হওয়া বিতর্কটিকে আমরা প্রবন্ধের বর্তমান পরিসরে যতটা সম্ভব বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো।

জনযুদ্ধের পথ থেকে সরে আসার পদক্ষেপটিকে CPN(M)-এর দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি হিসাবে দেখার পেছনে মূল যুক্তিগুলি ছিল সংক্ষেপে এইরকম; ক) রাষ্ট্রসংঘের নজরদারির অধীনে নিজেদের অস্ত্র সমর্পণ করে CPN(M) ঐতিহাসিক জনযুদ্ধের সাফল্যের মূল চাবিটিকেই হাতছাড়া করে ফেলেছে; খ) জনযুদ্ধের দাপটে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী যখন ক্রমশঃ পিছু হটছে, তখন পুনরায় প্রকাশ্য গণআন্দোলনে ফিরে যাওয়ার মত রক্ষণাত্মক রণকৌশল নয়, প্রয়োজন ছিল আরও আক্রমণাত্মক রণকৌশলের, জনযুদ্ধকে আরও তীব্রতর করে তোলার মধ্যে দিয়েই যা একমাত্র কার্যকরী হতে পারতো; গ) এপ্রিল গণআন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন রাজধানী কাঠমাণ্ডুর বুকে রাজপ্রাসাদকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে নামছে, তখন আপসকামী 'সাতপার্টি জোট'-এর সঙ্গে গণআন্দোলনে যুক্ত না থেকে উচিত ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ডাক দেওয়া, যা না করে CPN(M) মূলতঃ সংসদীয় পথের চোরাবালির মধ্যেই পা বাড়ালো।

ক) যুক্তিটি নিঃসন্দেহে স্পর্শকাতর। চিরায়ত মার্কসবাদী দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে, রাষ্ট্র যেহেতু এক শ্রেণি কর্তৃক অন্য শ্রেণির ওপর দমন-পীড়ন চালানোর একটি **সশস্ত্র** সংগঠন, কাজেই তাকে মোকাবিলা করার জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন সন্দেহাতীত। কিন্তু দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা এই সশস্ত্র প্রস্তুতিCPN(M) কি এককথায়, একপাক্ষিকভাবে রাষ্ট্রের কাছে 'সমর্পণ' করলো? বিষয়টা এতটা সরল নয়। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবতঃ এই প্রথম রাষ্ট্র একপাক্ষিকভাবে বিপ্লবীদের নয়, বরং **বিপ্লবীরাও** একই সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করেছে **রাষ্ট্রকে**। শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষকদের নজরদারীতে সমপরিমাণ অস্ত্র জমা রেখেছে দু'পক্ষই—রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী বিপ্লবীরা। সেই অস্ত্রাগারের চাবিও আবার রাখা রয়েছে তিনটি পক্ষের কাছে—রাষ্ট্রপক্ষ, বিপ্লবী পক্ষ এবং রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক দল। এতটা 'শর্তাধীন অস্ত্র সমর্পণ'-এর উদাহরণ সাম্প্রতিক অতীতে একেবারেই বিরল নয় কি? বস্তুত, এই ঘটনাটিকে কেবল বিপ্লবীদের 'অস্ত্র সমর্পণ' হিসাবে দেখলে একটি নজীর-বিহীন ঘটনাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে কেবল বঞ্চিতই করা হবে। ঘটনাটির গুরুত্ব যে নেপাল রাষ্ট্রের কাছেও যথেষ্ট, তা এমনকি পরবর্তীতেও নানান আপোসপন্থী পার্টির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি তৈরী হওয়ার সময় পর্যন্ত একবারের জন্যও CPN(M) ঘোষণা করেনি যে তারা তাদের 'গণমুক্তি ফৌজ'কে তুলে দিচ্ছে। উপরন্তু, শান্তি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী 'গণমুক্তি ফৌজ'-এর ২০ হাজার যোদ্ধা যখন ক্যান্টনমেন্টে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছে, ঠিক তখনই অত্যন্ত সচেতনভাবে CPN(M) গড়ে তুলেছে YCL নামে কয়েক লক্ষ সদস্য বিশিষ্ট নতুন একটি জঙ্গী যুব সংগঠন, চরিত্রগতভাবে যা গণমিলিশিয়া-র খুবই কাছাকাছি। এই YCL-কে নিয়ে বর্তমান নেপালের আপোসপন্থী শক্তিগুলির যে উদ্বেগের সীমা নেই, তা তাদের প্রতিক্রিয়া থেকেই স্পষ্ট। সব মিলিয়ে ঘটনাটা তাহলে কি দাঁড়ালো? প্রথমতঃ রাষ্ট্রসংঘের নজরদারীতে অস্ত্র জমা রাখলেও সেই অস্ত্রের ওপর CPN(M)-এর নিয়ন্ত্রণ থেকে যাওয়া নিয়ে খোদ রাষ্ট্র-ই এখনও উদ্বিগ্ন; দ্বিতীয়তঃ অস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম এমন যোদ্ধার সংখ্যা এই পর্যায়ে কমে তো নিই-ই, উল্টে CPN(M) পরিকল্পিতভাবে এই সংখ্যাকে ক্রমশঃ বাড়িয়েছে; তৃতীয়তঃ নির্বাচনের পর প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রাষ্ট্র, সরকারী সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বিপ্লবী একটি ফৌজের উপস্থিতি কেবল স্বীকার করে চলতেই বাধ্য হচ্ছে না, তাকে প্রয়োজনীয় রসদও যুগিয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছে! সামগ্রিকভাবে এই বিষয়গুলির কথা বিবেচনা করলে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোটা যুক্তিযুক্ত হবে, তা হল, অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করা আর অস্ত্রের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া—দুটি এক জিনিস নয়। CPN(M) এখনও পর্যন্ত প্রথমটি করেছে, দ্বিতীয়টি নয়। রাষ্ট্রসংঘের বকলমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভারত রাষ্ট্র এবং নেপালের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণি সকলেই এ'বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এবং সে'কারণে চিন্তিতও।

রাজনৈতিক, বিশেষতঃ সামরিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে খ) যুক্তিটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দশ বছরের ঐতিহাসিক জনযুদ্ধ যখন রীতিমতো বিজয় পর্বের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, একটার পর একটা আক্রমণে ক্রমাগত পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটছে রাষ্ট্রীয় বাহিনী, সমগ্র দেশের ৭৫টি জেলার মধ্যে কমবেশী ৬৮টি জেলায় যেখানে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তখন, সেই অগ্রগতির ধারাবাহিকতায়, আপোষ-মীমাংসার পথে না হেঁটে সশস্ত্র সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করাটাই কি যুক্তিযুক্ত ছিল না? যান্ত্রিকভাবে বিচার করলে এক্ষেত্রেও বেঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। প্রথমতঃ জনযুদ্ধের যে অগ্রগতি প্রথম দশ বছরে নানান কারণে সম্ভবপর হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে আরও আক্রমণাত্মক হলে তা আরও সফল হত, এমনটা এককথায় বলা চলে না। দশ বছরের সশস্ত্র লড়াইয়ে CPN(M) মূলতঃ দেশের সেই সব অংশেই লাল ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল, যেগুলি তুলনামূলকভাবে প্রত্যন্ত, দুর্গম। রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলগুলিতে তুলনায় দুর্বল ছিল। তদুপরি রাষ্ট্রের বেতনভুক সেনাদের পক্ষে, তা তারা যতই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হোক না কেন, পাহাড় জঙ্গলের দুর্গম পরিবেশে স্থানীয় গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে লাগাতার চোরাগোপ্তা লড়াইয়ে সফল হওয়াটাও যথেষ্ট সমস্যার ছিল। কাজেই, প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি থেকে রাষ্ট্রীয় বাহিনী প্রতিদিন পিছু হটেছে, একথা সত্যি। কিন্তু তার সাথে সাথে এটাও সত্যি, যে, সেই বাহিনী ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাজধানী সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে। সংখ্যা ও অস্ত্রের বিচারে বেশ কয়েকগুণ বেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় বাহিনী যখন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরাঞ্চলগুলিতে নিজেদের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করলো, তখন বিপ্লবী শক্তি ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মধ্যে সামরিক ভারসাম্যের যে একটা পরিবর্তন ঘটলো—তা বিচার না করলে ভুল হবে। শহরাঞ্চলে দুর্বল গণভিত্তি নিয়ে কেন্দ্রীভূত একটি মিলিটারি বাহিনীকে, যারা আবার রাষ্ট্রের প্রতি একশো শতাংশ অনুগত, সম্মুখ সমরে পরাজিত করার সামর্থ্য স্পষ্টতই CPN(M)-এর ছিল না। তারা সেই চেষ্টাও করেনি। বরং শুধুমাত্র সামরিক লাইনের সাফল্যের ওপর নির্ভর না করে তারা বিকল্প রণকৌশল গ্রহণ করেছে। সেই রণকৌশল কতটা ঠিক হয়েছে কি হয়নি, তার বিচার আমরা পরে করবো। কিন্তু শুধুমাত্র সামরিক লাইনকেই আঁকড়ে ধরে থাকলে CPN(M) কি করতে পারতো? হয়তো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে আরও কিছু বছর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ জারি রাখতে পারতো। কিন্তু তাতে করে সমগ্র দেশ তো বটেই, এমনকি

নিজেদের প্রভাবাধীন অঞ্চলের মেহনতী মানুষেরও মৌলিক সমস্যাবলীর কোনও স্থায়ী সমাধান ঘটানো CPN(M)-এর পক্ষে সম্ভব হতো না। রাষ্ট্রশক্তিতে নিয়ন্ত্রণকারী হয়ে উঠতে না পারলে তা সম্ভব হওয়ার কথাও নয়। ফলে অন্যদিক থেকে বিচার করলে, দশ বছরের জনযুদ্ধের সাফল্য, ২০০৬ সালে প্রায় তার সর্বোচ্চ বিন্দুতে এসে পৌঁছায়; পরিস্থিতি এক অর্থে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র সামরিক লাইনকে কেবল আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এই সম্পৃক্তি কাটিয়ে ওঠা CPN(M)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, সামরিক সাফল্যের সর্বোচ্চ বিন্দু, এক অর্থে, রাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষিরও সর্বোচ্চ বিন্দু— এ'কথা ভুলে যাওয়াটা ঠিক নয়। ঘটনা যদি এমনটা হতো, যে, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জেতার বদলে 'গণমুক্তি ফৌজ' ক্রমাগত হেরে চলেছে, একের পর এক ঘাঁটি এলাকা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখন নিজেদের শর্তে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে কোনও সমঝোতায় পৌঁছানো CPN(M)-এর পক্ষে সম্ভবই হতো না। সন্ধির ভারসাম্য সবসময়েই ঝুঁকে থাকে বিজেতার দিকে। কাজেই, জয়ের মুহূর্ত আবশ্যিকভাবেই কেবল আরও বেশী আক্রমণাত্মক হওয়ার মুহূর্ত—এ'ভাবে দেখাটা যান্ত্রিক—অন্যভাবে দেখলে, সন্ধির পক্ষেও সেটি সবচাইতে লাভজনক মুহূর্তও বটে। সেদিক থেকে বিচার করলে বিজয়ের মুহূর্তে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে আপাতভাবে সমঝোতা করে CPN(M) সর্বোচ্চ সুবিধাই আদায় করে নিয়েছে। তৃতীয়তঃ, যে কোনও সমঝোতাই যেহেতু দ্বিপাক্ষিক সম্মতির ওপর নির্ভরশীল, কাজেই বিচার করা প্রয়োজন, রাষ্ট্রশক্তিই বা CPN(M)-এর সঙ্গে হঠাৎ সমঝোতা করতে রাজী হলো কেন? উল্লেখ্য, দশ বছরের জনযুদ্ধের পর্যায়ে ২০০১ সালে একবার, এবং ২০০৩ সালে আরও একবার, CPN(M)-এর সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তি সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে; কিন্তু সেই দুটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রশক্তি নিজের অবস্থানে অটল থাকায় সমঝোতা প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কারণ তখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের ধারণা ছিল, কেবলমাত্র সামরিক উপায়েই CPN(M)-এর ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব। ২০০৫-২০০৬ সালে পরিস্থিতিটি ছিল ভিন্ন। রাষ্ট্রশক্তি ও এ'সময় উপলব্ধি করে যে, দেশের একটি বড় অংশকে CPN(M)-এর প্রভাবমুক্ত করাটা শুধু সামরিক উপায়ে আর সম্ভব নয়। রাজধানী কাঠমাণ্ডু সহ দেশের বড় বড় শহর ও শিল্পকেন্দ্রগুলিতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সমর্থ হলেও কৃষি-নির্ভর নেপালের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে যে কার্যত সমান্তরাল প্রশাসন চলছে, এবং তা ক্রমশ আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠে ক্ষমতার ভারসাম্যকে পাকাপাকিভাবে উল্টে দিতেও পারে—রাষ্ট্রক্ষমতার ধারক-বাহকরাও সেই আশঙ্কায় আশঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাহলে বিকল্প কি? বিকল্প একটাই। বিপ্লবীদেরও স্বীকৃতি দাও! তাদেরকেও ক্ষমতা-কাঠামোয় অঙ্গীভূত করার চেষ্টা কর! প্রয়োজনে রাজতন্ত্রের বদলে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রণয়ন করে রাষ্ট্রের বাহ্যিক রূপের অদল-বদল ঘটিয়ে সেই সংসদীয় কাঠামোয় বিপ্লবীদেরও জড়িয়ে নাও! তাতে অন্তত সামগ্রিকভাবে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হবে। স্মরণ করাটা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বিপ্লবীদের নির্মূল করতে না পারলে প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে সমঝোতা করাটাই যে তুলনায় বুদ্ধিমানের কাজ, ভারতের শাসকশ্রেণিও সে'সময়ে ক্রমশ এই অবস্থানের দিকে ঝুঁকতে থাকে এবং স্বভাবতই নেপালে তাদের শ্রেণি-ভ্রাতাদেরও সেই অবস্থানের দিকে প্রভাবিত করতে থাকে। প্রথমদিকে ভারতের শাসকশ্রেণির এ'নিয়ে একটা দোদুল্যমানতা ছিল। এমনকি, CPN(M)-কে নির্মূল করতে প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পাঠানো হবে কিনা—ত নিয়েও তখন চর্চা শুরু হয়। দেশের বড় বড় বুর্জোয়া প্রেসগুলোর সম্পাদকীয় কলমে সে'সময়ে বিষয়টি নিয়ে রাষ্ট্রের মতপার্থক্যও কিছুটা প্রকাশ্যে আসে। একটা মত ছিল, নেপালে বিপ্লবীদের বাড়বাড়ন্ত ঘটলে তা যেহেতু ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনেও উৎসাহ যোগাবে, কাজেই অবিলম্বে ভারতীয় সেনা পাঠিয়ে নেপালী বিপ্লবীদের দমন করা উচিত। অন্য মতটি ছিল, একটি প্রতিবেশী দেশে ব্যাপক সংখ্যাগুরু মানুষ যখন স্পষ্টা-স্পষ্টি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে, তখন খোলাখুলিভাবে রাজার পাশে দাঁড়ানোটা কূটনৈতিক দিক থেকে খুব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কাজ হবে না, বিশেষ করে সেই রাজার গদিই যখন অনিশ্চিত। তার চেয়ে বরং রাজতন্ত্রের বদলে বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা প্রণয়ন করে বিপ্লবীদের সঙ্গে ক্ষমতা-কাঠামো ভাগ-বাঁটোয়ারা করাটাই শ্রেয়; তাতে একদিকে যেমন সংসদীয় ক্ষমতার বেড়াজালে বিপ্লবীদের বেঁধে ফেলার একটা চেষ্টা করা যাবে, অন্যদিকে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাটাকেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে, যে বিষয়টি আবার কিনা নেপালের বাজারে দীর্ঘদিন ধরে লগ্নি হয়ে চলা কোটি কোটি টাকার ভারতীয় পুঁজিকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচাবে। ভারতীয় শাসকশ্রেণি তৎকালীন পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মতটিকেই বেছে নেয় এবং সেই মতের অভিমুখে নেপালের ভবিষ্যতকে পরিচালিত করতে এমনকি সি পি এম পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট-কে সমঝোতাকারী দূত হিসাবে নেপালে প্রেরণও করে। সব মিলিয়ে, একদিকে গৃহযুদ্ধে ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়া পরিস্থিতি, অন্যদিকে প্রবল আন্তর্জাতিক চাপ, এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবে বিপ্লবীদের সঙ্গে সমঝোতায় না এসে নেপালী শাসকশ্রেণিরও কার্যত কোনও উপায়ান্তর ছিল না। CPN(M)-ও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বিপক্ষের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সমঝোতা সূত্রের ভারসাম্যকে যতটা সম্ভব নিজেদের দিকে ঝুঁকিয়ে নেওয়ার কৌশল নেয়—তৎকালীন পরিস্থিতির বিচারে যা সঠিক রণকৌশলেরই মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

এবার আসা যাক যুক্তি (গ)-এ। রাজতন্ত্র উচ্ছেদের দাবিতে এপ্রিল গণআন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন রাজধানী কাঠমাণ্ডুর বুকে সমাবেশিত হচ্ছে, রাজকীয় সেনার সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, রাজপ্রাসাদ ঘিরে উত্তাল বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তখন মনে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, যে, ২০০৬-এর এপ্রিল ছিল রাজধানীর বুকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সেরা সময়, তথা বৈপ্লবিক উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সেরা সুযোগ। তৎপূর্ববর্তী সময়ে, দশ বছরের জনযুদ্ধে দেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে অস্ত্রের লড়াইয়ে বিপ্লবীদের সাফল্যের খতিয়ানকে হিসাবের মধ্যে ধরলে এমন মনে হওয়াটা আরোই স্বাভাবিক। এ যেন '১৭ সালের রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রাক্‌মুহূর্ত! জারতন্ত্র উচ্ছেদের দাবিতে পেট্রোগ্রাডের রাজপথে শত সহস্র মানুষের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক এক পুনরাবৃত্তি! বাহ্যিক বিচারে নিঃসন্দেহে মিল ছিল। কিন্তু অমিলগুলিও খতিয়ে দেখার মত। জাতীয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ভিন্নতার কথা বাদ দিয়ে যদি কেবল সামরিক দৃষ্টিকোন থেকেও দেখা যায়, এপ্রিল গণআন্দোলনকে আর একটা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে পরিণত করাটা বস্তুগতভাবেই সম্ভব ছিল না। দুটি পরিস্থিতির মধ্যে তুলনা করার জন্য আমরা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের তৎকালীন ঘটনাপঞ্জীর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারি—

> "১৯১৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি (৩রা মার্চ) তারিখে পেট্রোগ্রাডে পুলিটভ কারখানায় ধর্মঘট শুরু হইল। ২২ শে ফেব্রুয়ারি অধিকাংশ বড় বড় কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট করিল...........
>
> ২৪শে ফেব্রুয়ারি (৯ই মার্চ) বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইল আরও প্রবলভাবে। প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে তখনই ব্যাপৃত ছিল। ২৫শে ফেব্রুয়ারি পেট্রোগ্রাডের গোটা শ্রমিকশ্রেণিই বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল হইল। .........
>
> ২৬ শে ফেব্রুয়ারি (১১ই মার্চ) পাভ্‌লভ্‌স্কি রেজিমেন্টের মজুত ব্যাটেলিয়ানের চতুর্থ কোম্পানী গুলি চালায়। কিন্তু তাহারা শ্রমিকদের উপর গুলি চালায় নাই, চালায় সেই ঘোড়সওয়ার পুলিশদের উপর, যাহারা শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। ....

২৭শে ফেব্রুয়ারি (১২ই মার্চ) পেট্রোগ্রাডে সৈনিকরা শ্রমিকদের উপর গুলি চালাইতে অস্বীকার করে। ২৭ শে ফেব্রুয়ারি সকালে বিদ্রোহে যোগদানকারী সৈনিকদের সংখ্যা দশ হাজারের বেশি না হইলেও সন্ধ্যার মধ্যেই সংখ্যা ষাট হাজারের উপরে উঠিয়াছিল।

বিদ্রোহী শ্রমিক ও সৈনিকরা জারের মন্ত্রী ও সেনাপতিদের গ্রেপ্তার করিতে ও জেল থেকে বিপ্লবীদের ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিল। মুক্ত রাজনৈতিক বন্দীরা বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দিল।

রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে তখনও গুলি বিনিময় চলিতেছিল। পুলিশ ও সিপাহীরা বাড়ীর চোরকুঠুরীতে মেশিনগান লইয়া মোতায়েন ছিল। কিন্তু শীঘ্রই সৈনিকরা শ্রমিকদের পক্ষে চলিয়া গেল, এবং জারের স্বৈরতন্ত্রের ভাগ্য এই ঘটনায় নির্ণীত হইয়া গেল। .....”২

অর্থাৎ, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সাফল্যের পিছনে অন্যতম নির্ণায়ক ভূমিকাটি পালন করেছিল বিদ্রোহী সেনারা। তৎকালীন রাশিয়ায় নানান কারণে সেনাবাহিনীর মধ্যে জারশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ না থাকলে, অভ্যুত্থানকালীন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীতে ভাঙন দেখা না দিলে, বিদ্রোহী সেনাদের একটা বড় অংশ প্রত্যক্ষভাবে অভ্যুত্থানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ না করলে ফেব্রুয়ারি পরবর্তী রাশিয়ার ইতিহাস অন্য খাতে বইতো। সেই বিচারে এপ্রিল গণআন্দোলনের সময়ে নেপালের পরিস্থিতি ছিল একেবারেই আলাদা। রাজকীয় সেনাবাহিনীতে বড়-সড় কোনও ভাঙন তো ঘটেইনি, বরং ১৯৯৬ সাল থেকে ধরলে, দীর্ঘ এক দশক ধরে পরিস্থিতি তাদের পক্ষে ক্রমশই আরও প্রতিকূল হয়ে উঠলেও একবারের জন্যও সেনাবাহিনী রাজতন্ত্রের ওপর থেকে তার আনুগত্য প্রত্যাহার করেনি, ছোট-খাট কোনও অসন্তোষ বা বিদ্রোহের মতও কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত প্রায় ১ লক্ষ সেনার একটি কেন্দ্রীভূত বাহিনী সবসময়ই রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত প্রহরী হিসাবে নিজের ভূমিকা পালন করে গেছে। এপ্রিল গণআন্দোলনের, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মত পরিণতি না পাওয়ার পিছনে এটি একটি বড় কারণ। এবং সম্ভবত, নির্ণায়কও। তাছাড়া, এপ্রিল গণআন্দোলনে যে হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজতন্ত্র বিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছিল, তারা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে হলেও, সকলেই যে CPN(M)-এর সমর্থক ছিল, এমনটাও নয়। বিগত সদ্য সমাপ্ত ‘কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি’ নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় CPN(M) যেখানে ২৪০টি আসনের মধ্যে ১২০টিতে জয়লাভ করেছে (নেপাল কংগ্রেস ৩৭ এবং ইউ এম এল ৩৩টি আসনে), সেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক ভোটের হিসাবে নেপাল কংগ্রেস (প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ২২, ৬৯, ৮৮৩) এবং ইউ এম এল-এর (প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ২১,৮৩,৩৭০) তুলনায় তাদের ফারাক (প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ৩১,৪৪,২০৯) তুলনামূলক ভাবে কম; বরং কংগ্রেস এবং ইউ এম এল-এর মোট ভোটসংখ্যা CPN(M)-এর থেকে অনেকটাই বেশি। কাজেই অঙ্কের হিসাবেই, এপ্রিল গণআন্দোলনের সম্পূর্ণ রাশ CPN(M)-এর হাতে থাকার কথা নয়; সম্ভবতঃ তা ছিলও না। প্রশ্ন উঠতে পারে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় বলশেভিকরাও সমাজে সংখ্যালঘু ছিল; তা সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারির সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটেছিল এবং বলশেভিকরা তাকে অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিণতিতে নিয়ে যেতে পেরেছিল। নেপালে সেরকমটা ঘটলো না কেন? ঘটলো না, কারণ বস্তুগতভাবেই নেপালের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ততটা পরিপক্ক ছিল না। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় রাশিয়ার সংখ্যাগুরু মানুষের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ছিল মেনশেভিক এবং সোসালিস্টরা। এমনকি জারতন্ত্রের পতনের পর, সোভিয়েতগুলির নির্বাচনেও তারাই সংখ্যাগুরু আসনে প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যে ঘটতে পেরেছিল, তার কারণ, জনগণের বৈপ্লবিক উদ্যমকে অনুমোদন না করে তাদের উপায় ছিল না। সমাজের বৈপ্লবিক পরিস্থিতির পরিপক্কতাই ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল, কোনও রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছা নয়। পরবর্তীতে সেই বৈপ্লবিক জোয়ারকেই প্রতিহত করার চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েক মাসের মধ্যে মেনশেভিক ও সোসালিস্টরা তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হাতছাড়া করে, অন্যদিকে সেই স্রোতকে সঠিক খাতে বইয়ে দেওয়ার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে সমাজের চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে বলশেভিকরা — তৈরি হয় অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত্তিভূমি।

১৯১৭ সালের রাশিয়ায় সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এবং তার কয়েক মাসের মধ্যেই অক্টোবর বিপ্লব কেন সফল হতে পেরেছিল, সে প্রসঙ্গে বলশেভিক পার্টির বিশ্লেষণকে এই প্রসঙ্গে আরও একবার আলোচনায় আনা যেতে পারে:

“রুশদেশে অপেক্ষাকৃত সহজে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার কয়েকটি কারণ ছিল। নিম্নলিখিত প্রধান কারণগুলি লক্ষ্য করার বিষয়:

(১) রুশ বুর্জোয়াশ্রেণির মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সংগঠন ব্যাপারে অপরিণত ও রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছিল অক্টোবর বিপ্লব। অর্থনীতির দিক হইতে তখনও দুর্বল এবং সরকারী ঠিকাদারির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলিয়া রুশ বুর্জোয়াশ্রেণির না ছিল যথেষ্ট রাজনৈতিক আত্মপ্রত্যয়, না ছিল বিপজ্জনক পরিস্থিতি হইতে পথ খুঁজিয়া বাহির হওয়ার মতো উদ্যোগ। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণির সঙ্গে রাজনৈতিক জোট বাঁধিবার অভিজ্ঞতা বা ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণির মতো ব্যাপকভাবে পরিকল্পিত সুচতুর আপস-নিষ্পত্তির শিক্ষা—কোনটাই তাহাদের ছিল না। ........

(২) অক্টোবর বিপ্লবের পুরোভাগে ছিল রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণির মতো একটি বিপ্লবী শ্রেণি। সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এই শ্রেণি ইস্পাতের মতো দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল; অল্পকালের মধ্যে দুইটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতাও ইহার ছিল; তৃতীয় বিপ্লবের প্রাক্কালে এই শ্রেণিই শান্তি, ভূমি, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে জনগণের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। রুশ শ্রমিকশ্রেণির মতো নেতৃত্ব যদি বিপ্লবে না থাকিত, জনগণের আস্থা অর্জন করিয়াছে এমন নেতা যদি না মিলিত, তবে শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ঘটিত না, এবং ঐ মৈত্রী না ঘটিলে বিজয়ও সম্ভব হইত না।

(৩) কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, বিপ্লবসাধনে সেই দরিদ্র কৃষকদের মতো বলিষ্ঠ এক মিত্র রুশ শ্রমিকশ্রেণি পাইয়াছিল। ... যে মাঝারি চাষিরা বহুদিন দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল এবং মাত্র অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে সর্বান্তঃকরণে বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলাইল, সেই মাঝারি চাষিরা যে কি করিবে, তাহাও নির্ধারিত হইয়া গেল এই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর দ্বারা। এই মৈত্রী ছাড়া অক্টোবর বিপ্লব যে জয়যুক্ত হইত না তা বলাই বাহুল্য।

(৪) রাজনৈতিক সংগ্রামে বারবার পরীক্ষিত ও পরিশোধিত বলশেভিক পার্টির মতো সাহস ও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার পথে যে নানা প্রচ্ছন্ন বাধা থাকে সেগুলি কাটাইয়া যাইবার মতো সতর্কতা ছিল বলিয়াই শুধু বলশেভিক পার্টির মতো পার্টি এমন নিপুনভাবে একটি

ব্যাপক বিপ্লবী প্রবাহের মধ্যে, যুদ্ধ-শান্তির দাবীতে সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের দাবীতে অত্যাচারিত জাতিসমূহের আন্দোলন, এবং বুর্জোয়াশ্রেণির উচ্ছেদ ও সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্ব স্থাপনের দাবিতে সর্বহারাশ্রেণির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মতো বিভিন্ন বিপ্লবী ধারাকে মিশাইয়া দিতে পারিল।

এই বিভিন্ন বিপ্লবী ধারাকে একটি ব্যাপক ও শক্তিশালী বিপ্লবী প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত করাই যে রুশদেশে পুঁজিতন্ত্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৫) অক্টোবর বিপ্লব যখন আরম্ভ হয়, তখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলিতেছে প্রবল বেগে, তখন প্রধান বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শত্রুতা তাহাদিগকে দুই শিবিরে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তখন তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে এবং পরস্পরের সর্বনাশ সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এবং সেইজন্য তাহারা 'রুশদেশের ব্যাপারে' হস্তক্ষেপ করিয়া উঠিতে পারে নাই এবং সক্রিয়ভাবে অক্টোবর বিপ্লবের বিরোধিতা করিতে পারে নাই।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ে ইহা যে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।"[৫]

রুশদেশে একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতির যথাযথ বিকাশ এবং বিজয় তথা পূর্ণতা প্রাপ্তির কারণ হিসাবে বলশেভিক পার্টি যে বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করেছে, সেগুলি পর্যালোচনা করলেও নেপালের বৈপ্লবিক পরিস্থিতির অবজেকটিভ শর্তাবলী ও সাবজেকটি প্রস্তুতির অপরিপূর্ণতা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব। দশ বছরের জনযুদ্ধ যে উচ্চতাতেই উঠুক না কেন, CPN(M)-এর পক্ষে এক ঝটকায় এতগুলি ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা তথা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে যাওয়াটা সম্ভব ছিল না। (১) নং বিষয়টির কথাই ধরা যাক। রুশ বুর্জোয়াশ্রেণি যেখানে ছিল 'দুর্বল', 'অপরিণত', নেপালের আর্থসামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেখানে অনেকটাই আলাদা। দেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামো বজায় থাকলেও এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক রূপ হিসাবে রাজতন্ত্রের উপস্থিতি থাকলেও নেপালের প্রধান প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে পুঁজিবাদী উপাদানের রমরমাও কিছু কম নয়। রাজা কেবল সেই দেশের প্রশাসনিক কর্তাই নয়, একই সঙ্গে দেশের সর্ববৃহৎ টেলিকম শিল্প, সর্ববৃহৎ সিগারেট শিল্প, হোটেল শিল্প ইত্যাদির মালিকও বটে। রাজপরিবারের আমলাতান্ত্রিক পুঁজিই কেবল নয়, নেপালের ক্রমবর্ধমান বাজার থেকে মুনাফা তুলতে এবং শস্তা শ্রমিকের খোঁজে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে শুরু করে ভারত বা চীনের মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রেরও কোটি কোটি টাকার পুঁজি যেখানে লগ্নীকৃত। সামগ্রিকভাবে এই বিপুল পরিমাণ দেশী ও বিদেশী পুঁজির লগ্নিকারী তথা রক্ষাকর্তারা, অর্থাৎ সোজা কথায় বুর্জোয়াশ্রেণি, ১৯১৭ সালের রাশিয়ার তুলনায় দুর্বল তো নয়ই, বরং তুলনায় অনেক বেশি সংগঠিত; রাষ্ট্রশক্তিতেও তাদের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি নির্ধারক। আন্তর্জাতিক রক্ষাকর্তাদের বলে বলীয়ান হয়ে সংসদ থেকে সেনাবাহিনীর কম্যান্ড, সর্বত্রই এদের প্রভূত নিয়ন্ত্রণ। শুধুমাত্র রাজতন্ত্র বিরোধী জনজোয়ারের ওপর ভিত্তি করে, সামন্ততন্ত্র বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামকে মূলধন করে, শক্তিশালী এই বুর্জোয়াশ্রেণি তথা পুঁজিবাদের সঙ্গে একটি অন্তিম ও নির্ণায়ক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ ঐতিহাসিকভাবেই নেপালের বিপ্লবীরা পায়নি, ঐতিহাসিকভাবেই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ততটা পরিপক্ক হয়ে ওঠে নি। (২) নং বিষয়টিকে বিবেচনা করলে, নেপালের শ্রমিকশ্রেণিও ততটা শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি, যতটা শক্তি থাকলে একটি সমাজ বিপ্লবকে পূর্ণ নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব। (৪) নং বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বলশেভিকরা কেবল জারতন্ত্র বিরোধী বিক্ষোভকে নয়, তার সাথে যুদ্ধ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জমিদারী বিরোধী কৃষক আন্দোলন, পুঁজিপতিশ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন প্রভৃতি 'বিভিন্ন বিপ্লবী ধারাকে একটি ব্যাপক ও শক্তিশালী বিপ্লবী প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত' করার এক ঐতিহাসিক সুযোগকে কাজে লাগাতে পেরেছিল। নেপালের পরিস্থিতি ছিল সেই তুলনায় অনেক বেশি অপরিপক্ক, অনেক বেশি একমাত্রিক। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ-ই ছিল সেখানে মূল সামাজিক অ্যাজেন্ডা, 'রিপাবলিক' গঠন করতে সম্মত হওয়ার মাধ্যমে নেপালী শাসকশ্রেণি যে সামাজিক দাবিকে অনেকাংশেই মীমাংসা করে ফেলতে সক্ষম নয়। সর্বোপরি, (৫) নং বিষয়টির নিরীখে বিচার করলে দেখা যাবে নেপালের পরিস্থিতি ছিল তৎকালীন রাশিয়ার একেবারে বিপরীত। দুনিয়ার একনম্বর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র আমেরিকা থেকে শুরু করে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের মত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত নেপালী শাসকশ্রেণিকে মদত যোগাতে যোগাতে গেছে; প্রতিমুহূর্তে সতর্ক থেকেছে যাতে কোনমতেই নেপালের রাষ্ট্রক্ষমতায় বিপ্লবীরা তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করতে না পারে। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের এই ধারাবাহিক হস্তক্ষেপও নেপালের বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশে একটি বড় অন্তরায় হিসাবে কাজ করে এসেছে, এখনও করছে।

চীন বিপ্লবের আদলে 'দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পথে' হাঁটলেও, এবং সেই যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও, তৎকালীন চীনের সার্বিক পরিস্থিতির তুলনাতেও নেপালের বর্তমান পরিস্থিতির অমিল ছিল আরও বেশি। 'রাষ্ট্র' হিসাবেই বিগত শতাব্দীর চার-এর দশকের চীনের তুলনায় বর্তমানের নেপাল অনেক বেশি সংহত, অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত। পশ্চাদপদ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামো এবং সামন্ততন্ত্রের বাহ্যিক রূপ হিসাবে রাজতন্ত্রের উপস্থিতি সত্ত্বেও, নেপালের রাষ্ট্রযন্ত্র অনেকাংশেই বিকশিত হয়েছে একটি 'আধুনিক রাষ্ট্র'-এর মতন করে—প্রশাসনিক থেকে সামরিক ক্ষমতা সেখানে অনেক কেন্দ্রীভূত, বহুলাংশে শহরকেন্দ্রীক। কাজেই নেপালের পরিপ্রেক্ষিতে, বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা দখল করে রাখাটা, রাষ্ট্রক্ষমতায় পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েমের 'আবশ্যিক শর্ত' হলেও 'যথেষ্ট শর্ত' ছিল না। তৎসহ চীনদেশের তৎকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে নেপালের অন্যান্য পার্থক্য তো ছিলই। —অর্থাৎ, বিভিন্ন দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে, সামগ্রিকভাবে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোই যুক্তি-যুক্ত হবে যে, নেপালের বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশ বর্তমান পর্যায়ে ততটুকুই ঘটতে পেরেছে, ততটুকুই 'পরিণতি' পেয়েছে, ঐতিহাসিকভাবে যতটা ঘটা সম্ভব ছিল। নিঃসন্দেহে, অন্ততঃ এই পর্যায়ের জন্য, এই বিকাশকে ত্বরান্বিত করার পিছনে CPN(M)-এর নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিপ্লবী আন্দোলনের চূড়ান্ত বিকাশের যে পর্যায়টি অধরা রয়ে গেল, তার সম্পূর্ণ দায় CPN(M)-এর নয়। বস্তুত গণআন্দোলনকে বৈপ্লবিক দিশায় পরিচালনা করার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের সচেতন ভূমিকার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু খেয়াল রাখা প্রয়োজন, কোনও রাজনৈতিক দলের 'শুভ আকাঙ্ক্ষা' দিয়েই কেবল আবার বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশের গতি নির্দ্ধারিত হয় না; সে ক্ষেত্রে নির্ণায়ক বিষয়টি হল বিপ্লবের অবজেকটিভ এবং সাবজেকটিভ শর্তাবলীর পরিপক্কতার মাত্রা— যে ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ঐতিহাসিকভাবেই নেপালের বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে রয়েছে, অদূর ভবিষ্যতেও থাকবে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, 'কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি' নির্বাচনের পূর্ববর্তী এই কালপর্বটি শেষ হয় রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বিপ্লবীদের সমঝোতা ও পরিণতিতে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার'এ বিপ্লবীদের শর্তসাপেক্ষ অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে। 'অন্তর্বর্তীকালীন' চরিত্রের হলেও

তৎকালীন সরকারে CPN(M)-এর অংশগ্রহণের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করেও কিছু প্রাসঙ্গিক বিতর্কের জন্ম হয়। বিতর্কটিকে একটি পুস্তিকায়* তাত্ত্বিক আকারে হাজির করেছেন আমাদের রাজ্যের ট্রটস্কি-পন্থী রাজনৈতিক শিবিরের একটি অংশ। তাঁদের মূল যুক্তি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ববর্তী পর্যায়ে, 'জনগণের অভ্যুত্থানের' মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা 'সাময়িক বিপ্লবী সরকারেই' কম্যুনিস্ট বিপ্লবীরা কেবল যোগদান করতে পারে, অন্যথায় সেটি হবে একটি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি। নিজেদের তাত্ত্বিক অবস্থানের সমর্থনে তাঁরা রুশদেশের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের উদাহরণ দিয়েছেন। কমঃ লেনিনের লেখা কিছু প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, ১৯১৭ সালের রাশিয়ায় বলশেভিকদের 'সাময়িক বিপ্লবী সরকারের স্লোগান'-এর সঙ্গে নেপালের 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার'-এর প্রভেদ কোথায় এবং কতটুকু। 'জনগণের অভ্যুত্থান'-এর বিষয়টিই এপ্রশ্নে তাত্ত্বিকভাবে তাঁদের বক্তব্যের মূল জোরের জায়গা। নেপালের 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' যেহেতু 'জনগণের অভ্যুত্থান'-এর মাধ্যমে গড়ে উঠলো না, গড়ে উঠলো দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতা পর্বের মধ্যে দিয়ে, এবং রাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন দল কংগ্রেস থেকে শুরু করে ইউ এম এল-এর মতো সুবিধাবাদী ও সংস্কারপন্থী দল সকলেই যখন সেই সরকারে যোগ দিল, তখন সেই একই সরকারে কম্যুনিস্টদের যোগদান করাটা হলো বস্তুত বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল—এমনটাই এই পুস্তিকাটির মতামত। ঠিক এই স্পিরিটে না হলেও, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার'-এ CPN(M)-এর যোগদানের বিষয়টি নিয়ে ভারতের কম্যুনিস্ট বিপ্লবী মহলেও কোনও প্রশ্নচিহ্ন ছিল না, এমনটা নয়। 'কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি' নির্বাচনের পর, প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে জিতে এসে, CPN(M) বর্তমানে আরও পাকাপাকিভাবে সরকারের অংশ; প্রধানমন্ত্রীত্ব সহ গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদের বেশিরভাগটাই এখন তাঁদেরই দখলে। সেই অর্থে, বর্তমানে তাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতার প্রত্যক্ষ অংশীদার। ২০০৬-এর সমঝোতা-পর্ব, এমনকি ২০০৭-এর 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার'-এর পর্বের (যে সরকারে শতধীনে কখনও CPN(M) যোগ দিয়েছে, আবার কখনো শর্তভঙ্গের অভিযোগ তুলে বেরিয়েও এসেছে) সঙ্গেও বর্তমান এই পর্বের গুণগত পার্থক্য রয়েছে। নেপালী জনতার রাষ্ট্র বিরোধী যে আন্দোলনকে CPN(M) এতদিন নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে, সেই রাষ্ট্রেরই প্রত্যক্ষ অংশীদার এখন CPN(M) নিজে। কাজেই বর্তমান পর্বে CPN(M)-এর দ্বারা গৃহীত রাজনৈতিক লাইন, সেই লাইনের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং তাকে কেন্দ্র করে যে প্রাসঙ্গিক বিতর্কগুলি আবর্তিত হচ্ছে, সেগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পৃথকভাবেই আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা সেটিই করার চেষ্টা করবো।

## ২। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও নির্বাচন পরবর্তী পর্যায় ঃ

২০০৭-এর 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' এবং বর্তমানের স্থায়ী সরকারে যোগদানের বহু আগে থেকেই, এমনকি, ২০০৬-এর সমঝোতা পর্বে প্রবেশ করারও বেশ কিছুটা আগে, কোন্ ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেপালের বুকে তাঁরা কায়েম করতে চাইছেন, কি হবে সেই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, কোন্ উদ্দেশ্যেই বা পরিচালিত হবে সেই রাষ্ট্রযন্ত্র—সে সম্পর্কে CPN(M) তাদের বোঝাপড়া তৈরী করতে থাকে। সংগঠনের শীর্ষনেতাদের লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে, নানান সময়ে প্রকাশিত হওয়া বেশ কিছু সাক্ষাৎকারে এই বিষয়গুলির ধারাবাহিক উল্লেখ আছে। অর্থাৎ একটা ব্যাপার পরিষ্কার—দশ বছরের সশস্ত্র জনযুদ্ধ পরিচালনা করার পর, হঠাৎ করে রাজনৈতিক লাইন পাল্টে ফেলে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সমঝোতা-পর্বে তাঁরা প্রবেশ করেননি; সরকারে যোগদানের বিষয়টি তথা রাষ্ট্রক্ষমতায় শরিক হওয়ার বিষয়টিও অন্ততঃ তাঁদের দিক থেকে কোনও আকস্মিক পদক্ষেপ ছিল না। যা তাঁরা করেছেন—তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও তাঁরা আগাম হাজির করতে করতে গেছেন। কমঃ বাবুরাম ভট্টরাই রচিত 'নতুন ধরণের রাষ্ট্র গড়ার প্রশ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধটি থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টির অবতারণা করা যেতে পারে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> "জনযুদ্ধের রণনীতিগত ভারসাম্যের অবস্থা, দেশের মধ্যে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক, সংসদীয় ও রাজতন্ত্রের শক্তিগুলির ত্রিমুখী লড়াই, দুই দৈত্যাকার প্রতিবেশীর মাঝখানে এদেশের চিঁড়েচ্যাপ্টা অবস্থা ও স্পর্শকাতর ভূ-রণনীতিগত অবস্থান—এসব বিশেষ অবস্থার কথা মাথায় রেখে পার্টি এছাড়াও শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধানকল্পে ন্যূনতম প্রগতিশীল রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাবও দিয়েছে। পার্টি ২০০৩ সালের ২৭ এপ্রিল আলোচনার শেষ রাউন্ডে যে প্রস্তাব রাখে—আলোচনার জন্য দেওয়া CPN(M)-এর প্রস্তাবের সংক্ষিপ্তসার—তাতে নয়াগণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরও একধাপ নীচের একটি উৎক্রমণকালীন রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। পার্টি মনে করে যে এরকম একটি উৎক্রান্তিকালীন রাষ্ট্রে, যার অবস্থান হবে বুর্জোয়া সংসদবাদের উপরে কিন্তু নয়া গণতন্ত্রের নীচে, তা নেপালের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগতভাবে মানানসই হবে।"[৪]

অর্থাৎ সংক্ষেপে, কমঃ ভট্টরাই (ক) শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি নতুন ধরণের রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছেন এবং (খ) যে রাষ্ট্রের চরিত্র হবে উৎক্রান্তিকালীন, বুর্জোয়া সংসদবাদের উপরে কিন্তু নয়া গণতন্ত্রের নীচে।

শান্তিপূর্ণ পথে উত্তরণের বিষয়টি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। ট্রটস্কি পন্থীদের দ্বারা প্রকাশিত পুস্তিকাটিতে এই পথকে তীব্র সমালোচনা করে লেখা হয়েছে—

> "অর্থাৎ এই বিপ্লবী সরকারকে জনগণের অভ্যুত্থানের ওপর দাঁড়াতে হবে। তবেই সে সত্যিকারের বিপ্লবী সরকার হবে। এই সরকারই তো সংবিধান পরিষদ আহ্বান করবে এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলবে। কমঃ ভট্টরাই যে 'শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যার সমাধান' করতে চেয়েছেন, তাতে কি সংবিধান পরিষদ গঠন সম্ভব, না কি সম্ভব গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র?"

নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে, উক্ত পুস্তিকাটিতে এরপর লেনিনের একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে—

> "একটা প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে গেলে জনগণের প্রতিনিধিদের একটা পরিষদ দরকার যা একই সাথে হবে জনপ্রিয় (সার্বজনীন এবং সমান ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত) এবং সংবিধান পরিষদ, কংগ্রেসের প্রস্তাবে যা আবারো স্বীকৃত হয়েছে। যাই হোক, প্রস্তাব সেখানেই থেমে থাকতে পারে না। 'জনগণের ইচ্ছাকে সত্যি সত্যি প্রকাশ করবে' এমন একটা নতুন ব্যবস্থা গড়তে গেলে একটা প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদকে সংবিধান পরিষদ নাম দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। এই পরিষদের কিছু 'তৈরি করবার জন্য' ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব থাকা দরকার। এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে কংগ্রেসের প্রস্তাব একটি সংবিধান পরিষদের আনুষ্ঠানিক স্লোগানের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। বরঞ্চ যে সব বস্তুগত শর্তসমূহ এই ধরণের পরিষদকে তার কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে সমর্থ করে তোলে, তা যুক্ত করা দরকার। সংবিধান পরিষদ যাতে তার নামকরণের সার্থকতাকে প্রতিপন্ন করতে পারে, সেইজন্য এই

শর্তগুলোর নির্দিষ্টকরণ করা দরকার, কেননা সাংবিধানিক রাজতন্ত্রী পার্টি যারা কিনা উদার নৈতিক বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করে তারা যে সুচিন্তিতভাবে জনপ্রিয় সংবিধান পরিষদের স্লোগানকে বিকৃত করছে এবং তাকে একটা ফাঁকা বুলিতে পরিণত করছে তা আমরা বার বার বলেছি।

কংগ্রেসের প্রস্তাব বলছে যে একমাত্র একটি বিপ্লবী সরকার, যা কিনা একটি বিজয়ী জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের হাতিয়ার হবে, নির্বাচনী প্রস্তাবের প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে পারে এবং জনগণের ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে পারে এমন একটি পরিষদ আহ্বান করতে পারে। এই তত্ত্ব কি সঠিক? যে এটাকে বিরোধিতা করতে পারে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে জার সরকারের পক্ষে প্রতিক্রিয়ার পক্ষে না দাঁড়ানো সম্ভব; নির্বাচনের সময় তার নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব, তাকে এটা দেখাতে হবে জনগণের ইচ্ছা সত্যি সত্যিই প্রকাশ পাবে। এটা প্রমাণ করাটা এতটাই অসম্ভব যে কেউই প্রকাশ্যে এটাকে সমর্থন করার ঝুঁকি নেবে না, কিন্তু আমাদের ওভবজদেনিয়ের অভিজাতরা উদারনৈতিক রঙের আড়ালে গোপনে একে চোরাচালান করছে। কেউ না কেউ অবশ্যই সংবিধান পরিষদ আহ্বান করবে, কেউ না কেউ নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, কেউ না কেউ এই ধরণের একটা পরিষদকে পূর্ণ ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রদান করবে। অভ্যুত্থানের হাতিয়ার, একমাত্র এমন একটি বিপ্লবী সরকার, আন্তরিকভাবে তা চাইতে পারে এবং এই সব অর্জন করার জন্য যা যা প্রয়োজনীয় তা করতে সমর্থ হতে পারে। জার সরকার অতি অবশ্যই একে বিরোধিতা করবে। জারের সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছেছে এমন একটা উদারনৈতিক সরকার, যে কিনা পুরোপুরি গণঅভ্যুত্থানের উপর নির্ভর করে না, আন্তরিকভাবে এসব চাইতে পারে না, এমনকি যদি সবচেয়ে আন্তরিকভাবে সে চায়ও তা হলেও তা সে অর্জন করতে পারে না। (লেনিন সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড-৯, পৃঃ ২৫-২৬)"

অতঃপর, লেনিনের উদ্ধৃতির জের টেনে পুস্তিকাটিতে এই সিদ্ধান্ত টানা হচ্ছে—

"তাহলে লেনিনের বক্তব্য থেকে বিষয়টা কি দাঁড়াল? একমাত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা একটি বিপ্লবী সরকারই সংবিধান পরিষদ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে নিশ্চিত করতে পারে। অন্যথায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ....'

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে, পুস্তিকাটিতে যে যুক্তিকাঠামোটি সাজানো হয়েছে, তাকে উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সশস্ত্র জনযুদ্ধের পথ থেকে সরে এসে শান্তিপূর্ণ পথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উত্তরণের এই প্রচেষ্টাকে নিয়ে বিপ্লবী শিবিরের মধ্যেও যে কোনও বিভ্রান্তি নেই, এমনটা নয়। কতকগুলি প্রশ্নকে পর পর সাজিয়ে দেখা যাক। নেপালে ১০-ই এপ্রিল ২০০৮-এর সংবিধান পরিষদ নির্বাচন কে আহ্বান করলো? অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সেই সরকারে অন্যতম অংশগ্রহণকারী কারা? নেপাল কংগ্রেসের মত রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা, ইউ এম এল-এর মতো সুবিধাবাদী, সংসদসর্বস্ব সংস্কারপন্থীরা! সেই সরকার কি জনগণের অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে? না। গড়ে উঠেছে কংগ্রেস ও ইউ এম এল সহ 'সেভেন পার্টি অ্যালায়েন্স'-এর সঙ্গে CPN(M)-এর শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে! তাহলে সেই সরকারকে কি বিপ্লবী সরকার বলা চলে? না। এমনকি CPN(M) নিজেও এমনটা দাবি করছে না! মোটের ওপর ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াল? সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বর্জন করে, গণঅভ্যুত্থানের উপর নির্ভর না করে, রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষ রফার মাধ্যমে CPN(M) এক অবিপ্লবী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিল, যে সরকারই কিনা 'সংবিধান পরিষদ নির্বাচনের' আহ্বায়ক! আর লেনিন তো বলেইছেন এ'ধরণের সরকার, এমনকি সবচেয়ে আন্তরিকভাবে চাইলেও, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে নিশ্চিত করতে পারে না!!

কিন্তু বাস্তবতঃ বিষয়টি এতটা সরলরৈখিক নয়। একমাত্রিকও নয়। সংবিধান পরিষদ নির্বাচনের আহ্বায়ক 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠন এবং তার সাথে সশস্ত্র সংগ্রাম বা গণঅভ্যুত্থানের সম্পর্কটি ধরেই আলোচনা করা যাক। গণঅভ্যুত্থানের ওপর দাঁড়িয়ে সরাসরি রাজাকে বলপূর্বক সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' যে গঠন হয়নি সেকথা ঠিক। এমনকি প্রথম দিকে এই 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার বদলে তাকে সুরক্ষা দেবারই চেষ্টা করেছিল, সেটাও কারও অজানা নয়। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম বড় শরিক রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি নেপাল কংগ্রেস ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের লাগাতার প্রচেষ্টার পরেও সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হল কেন? রাজাকে 'নিয়মতান্ত্রিক প্রধান' হিসাবে টিঁকিয়ে রাখার অপচেষ্টা ব্যর্থ হল কেন? কোন্ চাপের কাছে নতিস্বীকার করে লাগাতার টালবাহানার পর অবশেষে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাজতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘোষণা করে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে বাধ্য হল? সংবিধান পরিষদ নির্বাচন নিয়েও বিস্তর টালবাহানা চালানোর পর, এমনকি দু-দুবার নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেও তা বাতিল করে দেবার পর, অবশেষে কোন্ বাধ্যবাধকতার জায়গা থেকে নির্বাচন আহূত হল? কোন্ জাদুবলেই বা সেই নির্বাচন নেপালের ইতিহাসের সবচেয়ে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হিসাবে স্বীকৃতি পেল? বস্তুত, এপ্রিল গণআন্দোলনে তুমুল অভিঘাতকে বাদ দিয়ে এসমস্ত কিছুই সম্ভব ছিল না। এপ্রিল গণআন্দোলনের অংশগ্রহণকারী ছিল আপামর জনসাধারণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের প্রতি তাঁদের আনুগত্য থাকলেও দাবি ছিল একটিই—রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা। এই দাবি থেকে বিচ্যুত হলে তাঁদের সমর্থিত রাজনৈতিক দলকেও তাঁরা ক্ষমা করতেন না! কারণ, 'গোপন অ্যাজেন্ডা' যার যাই থাক না কেন, এপ্রিল গণআন্দোলনের পর সেভেন পার্টি অ্যালায়েন্সের প্রতিটি দলই জনতার দাবিকে মৌখিক সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়েছিল। 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার'-ও গঠিত হয়েছিল মূলতঃ এই দাবিকেই সামনে রেখে। একটা দূর পর্যন্ত রাজতন্ত্রকে তলায় তলায় সুরক্ষা দানের চেষ্টা চালানোর পর, একটা সময় এই সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র হাড়ে হাড়ে টের পায়, বেশি টালবাহানা করলে ক্রমশঃ আরও বেশি জনমত CPN(M)-এর দিকে ঢলবে, কারণ তারাই রাজতন্ত্রের সবচেয়ে সোচ্চার বিরোধী। ২০০৭ সালের ১২-ই অগাষ্ট চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' থেকে CPN(M) বেরিয়ে যাবার পর এই চক্র সত্যি সত্যিই প্রমাদ গোনে! আরও বড় বিস্ফোরক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পেরে CPN(M)-কে সরকারে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ শুরু হয়, সাথে সাথে শুরু হয় নির্বাচনের দিন ঘোষণা করার তোড়জোড়। অতঃপর আরও একদফা টালবাহানার পর অবশেষে ২০০৮-এর ১০ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ ও রক্তপাতের আশঙ্কা থাকলেও বাস্তবতঃ তেমনটা ঘটলো না কেন? কারণ, এপ্রিল গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উজ্জীবিত হয়ে ওঠা নেপালী জনগণ সর্বান্তঃকরণে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাইছিলেন; সাগ্রহে দু'বছর ধরে তার জন্য অপেক্ষাও করছিলেন। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে এমন কোনও অপচেষ্টা, তা সে যে পার্টিই করুক না কেন, নেপালী

জনতা বরদাস্ত করতো না। নেপালী জনতার সার্বিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই সমস্ত অশান্তির আশঙ্কাকে দূরীভূত করে। অর্থাৎ, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' নির্বাচন পূর্ববর্তী পর্যায়ে যা যা ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে, বা নিতে বাধ্য হয়েছে, তার পিছনে মূল প্রভাবটি ছিল এপ্রিল গণআন্দোলনের। এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা নির্ণায়কও। এপ্রিল গণআন্দোলন নিজে অভ্যুত্থানের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে রাজাকে তাৎক্ষণিকভাবে সিংহাসনচ্যুত করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী দু'বছর ধরে তার অভিঘাত যেভাবে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার'-কে প্রভাবিত করতে করতে গেছে, তাকেও অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

আবার ঐতিহাসিক এই এপ্রিল গণআন্দোলন, ২০০৬-এই ফেটে পড়লো কেন? তার ১০ অথবা ২০ বছর আগে নয় কেন? রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নেপালী জনতার সংগ্রাম তো বহুদিনের পুরানো। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, বিগত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের শুরুতে প্রায় একই ধরণের আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল নেপালী জনতা। যার জেরে, প্রথমবারের জন্য নির্বাচন ডাকতেও বাধ্য হন তৎকালীন রাজা। কিন্তু সেদিনের সেই আন্দোলন, এপ্রিল গণআন্দোলনের উচ্চতায় উঠতে পারেনি কেন? কেন কেবলমাত্র রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন একটা ছেলে ভুলানো সংসদ নিয়েই তখনকার মতো নেপালী জনতাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল? নব্বই দশকের প্রথমার্ধ থেকে ২০০৬—এই কালপর্বে কি এমন ঘটলো, যাতে একই দাবিতে গড়ে ওঠা একই ধরণের একটি আন্দোলন 'এপ্রিল গণআন্দোলন'-এর উচ্চতা লাভ করলো? নিঃসন্দেহে, সেই ঘটনাটি হল ১৯৯৬ থেকে ২০০৬-এর সশস্ত্র জনযুদ্ধ। ১০ বছর ব্যাপী এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, হাজার হাজার শহীদের প্রাণের বিনিময়ে প্রায় ২৫০ বছরের পুরানো একটি সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তিকে পুরোপুরি ধরাশায়ী করতে পারেনি সত্যি, তবে বহুলাংশে পঙ্গু করে দিতে যে সক্ষম হয়েছিল, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। নচেৎ রাষ্ট্রশক্তিও বিপ্লবীদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে আগ্রহী হত না, যে কথা প্রবন্ধের প্রথমাংশেই আমরা বলেছি। সর্বোপরি, আবারও একটা কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন, CPN(M) এখনও একবারের জন্যও তাদের 'গণমুক্তি ফৌজ'-কে তুলে দেবার কথা উচ্চারণ করেনি। বরং উল্টে, রাষ্ট্রশক্তিকে বাধ্য করেছে ২০ হাজার সদস্যের এই বিশাল বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় খরচ বরাদ্দ করতে। বর্তমান প্রবন্ধটি যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখনও পর্যন্ত  এবং 'গণমুক্তি ফৌজ'-কে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দান থেকে শুরু করে তাকে রসদ জুগিয়ে চলা সংক্রান্ত গোটা ঘটনাটিই নেপালের বর্তমান সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের কাছে গলার কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে।

অর্থাৎ, সার্বিকভাবে দেখলে, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' থেকে শুরু করে বর্তমানের স্থায়ী সরকার, নেপালে গত দু'বছরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পুরোটাই সশস্ত্র বিপ্লবী উপাদান ব্যাতিরেকে কেবল শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে হয়েছে, এ'ভাবে দেখাটা কেবল অতিসরলীকরণ-ই নয়, মারাত্মক ভুলও হবে। কারণ, অনেকে এই ভুলটি আবার ইচ্ছাকৃতভাবেই করছে; যেমন আমাদের রাজ্যের সি পি এম। দলীয় মুখপত্র 'গণশক্তি'তে তাঁরা 'এপ্রিল গণআন্দোলন'-এর জয়গান গাইছেন ঠিকই, তবে তার ধাত্রী পূর্ববর্তী দশবছরের ঐতিহাসিক জনযুদ্ধের প্রসঙ্গটিকে সযত্নে বাদ রেখে। যেন এমন কোনও ঘটনা নেপালের বুকে কোনওদিন ঘটেইনি! পুরোটাই যেন সর্বদলীয় গণআন্দোলনের একটি সফল পরিণতি! পরিকল্পিত এই ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধেও আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

কমঃ ভট্টরাই-এর বক্তব্যের দ্বিতীয় প্রসঙ্গটিতে এবার আসা যাক। বর্তমানের নেপাল রাষ্ট্র, CPN(M) যে রাষ্ট্রক্ষমতার অন্যতম শরিক, সেই রাষ্ট্রের চরিত্র কি? CPN(M)-এর তত্ত্বায়ন অনুযায়ী এই রাষ্ট্রের চরিত্র উৎক্রান্তিকালীন, বুর্জোয়া সংসদবাদের উপরে কিন্তু নয়াগণতন্ত্রের নীচে।

'নয়াগণতন্ত্রের নীচে' কেন, তা মোটামুটি নেপাল রাষ্ট্রের বর্তমান সমন্বয় থেকে এবং CPN(M)-এর গৃহীত কর্মসূচী থেকে পরিষ্কার। 'নয়াগণতন্ত্রের রাজনীতি'-কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমঃ মাও সে তুং লিখেছিলেন—

> "চীনের সর্বহারাশ্রেণি, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য পাতিবুর্জোয়ারাই হচ্ছে মূলশক্তি যা দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। এই শ্রেণিগুলোর কোনো কোনোটি ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে, বাকিরা জাগছে; অনিবার্যভাবেই এরা হবে চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কাঠামোর মৌলিক উপাদান, আর সর্বহারাশ্রেণি হবে নেতৃত্বকারী শক্তি। যে চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আজ আমরা গঠন করতে চাই তা অবশ্যই হবে সর্বহারাশ্রেণির নেতৃত্বে সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্তবাদ বিরোধী জনগণের যুক্ত একনায়কত্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এবং এটাই হবে নয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, খাঁটি বিপ্লবী 'তিনটি মহান কর্মনীতি' সহ নতুন তিন-গণনীতির প্রজাতন্ত্র।"[৫]

স্পষ্টতঃই, নেপালের  বর্তমানের শ্রমিকশ্রেণি এতটা বিকশিত ও শক্তিশালী অবস্থায় নেই। তাছাড়া, খাতায় কলমে রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হলেও নেপালের রাষ্ট্রক্ষমতার বহু গভীরে সামন্ততন্ত্রের শিকড় এখনও যথেষ্ট শক্তপোক্ত। সবচেয়ে বড় কথা হল, নেপালের বর্তমান  সরকার এমন সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়ে চলছে, যারা কার্যত সামন্তবাদ বিরোধী তো নয়ই, বরং তার পৃষ্ঠপোষক। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রেও কমবেশী একই কথা প্রযোজ্য।

'নয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি' প্রসঙ্গে কমঃ মাও-এর ব্যাখ্যা ছিল—

> "এই প্রজাতন্ত্রে বড় ব্যাঙ্ক, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের মালিকানাধীনে থাকবে।
>
> 'মালিকানা চীন দেশীয়ই হোক অথবা বিদেশী হোক—যে প্রতিষ্ঠানগুলি একচেটিয়া চরিত্রের অথবা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার পক্ষে অত্যন্ত বড়—যেমন ব্যাঙ্ক, রেলপথ, বিমানপথের মত প্রতিষ্ঠান সমূহ—সেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও শাসিত হবে, যাতে ব্যক্তিগত পুঁজি জনগণের জীবনযাত্রার ওপর আধিপত্য না করতে পারে; এটাই হচ্ছে পুঁজি নিয়ন্ত্রনের মৌলিক নীতি।'
>
> এটাও হল কুওমিনতাঙের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির সহযোগিতার যুগে কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত ইস্তাহার থেকে উদ্ধৃত মহান বিবৃতি। এটাই হল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনের নির্ভুল কর্মনীতি। সর্বহারাশ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত নয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক চরিত্র সম্পন্ন হবে। এবং এটাই হবে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পরিচালক শক্তি।......"[৬]

পক্ষান্তরে CPN(M) প্রস্তাবিত কর্মসূচীতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতির কথা যেমন বলা আছে, তেমনি ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যোগে বৃহৎ শিল্প গঠনকে উৎসাহ দেওয়ার কথাও বলা আছে। পরিকাঠামোর বিকাশের মত বড় মাপের কাজের জন্য গ্রহণযোগ্য শর্তে প্রয়োজনে বিদেশী পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানানোর কথাও কর্মসূচীতে বলা হয়েছে। বড় ব্যাঙ্ক, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের মালিকানাধীনে আনতে হবে, এমন কোনও কর্মসূচী CPN(M) -এর নেই।

অর্থাৎ বিপ্লবোত্তর চীনের মত একটি নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের থেকে বর্তমানের নেপাল রাষ্ট্র চরিত্রগত জায়গায় ঠিক কোথায় পিছিয়ে, তা বেশ দৃষ্টিগ্রাহ্য রকমেরই পরিষ্কার। কিন্তু বুর্জোয়া সংসদবাদের থেকে এই রাষ্ট্র ঠিক কোথায় এগিয়ে? কতটুকু এগিয়ে?

বিভিন্ন লেখাপত্র, বিশেষ করে নির্বাচনের পর, CPN(M) -এর শীর্ষনেতাদের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে এ'প্রসঙ্গে মূল মূল যে বিষয়গুলি চিহ্নিত করা যাচ্ছে, তা হলো— (১) বর্তমান রাষ্ট্র, সামন্ততন্ত্রের যাবতীয় অবশেষকে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে,বুর্জোয়া সংসদবাদ প্রয়োজনে যেখানে সামন্তবাদের সঙ্গে আপোষ করে; (২) এই রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থানকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অনুশীলন করবে, বুর্জোয়া সংসদবাদ যেখানে সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় থেকে নিজের নিরাপত্তা খোঁজে; (৩) নেপালী জনতার জীবনযাত্রার সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়কে বর্তমান রাষ্ট্র নিরাপত্তা দেবে, যেখানে বুর্জোয়া সংসদবাদের মূল মনোযোগ থাকে ব্যক্তিপুঁজির শ্রীবৃদ্ধির দিকে; এবং (৪) বর্তমান রাষ্ট্র, নেপালের সংখ্যাগুরু নিপীড়িত জনতার রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করবে। অর্থাৎ সেই অর্থে সরকার চলবে নীচুতলার মানুষের দাবি ও চাহিদা মোতাবেক, যেখানে বুর্জোয়া সংসদবাদ মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও কার্যত চলে ওপর থেকে, জনগণ-বিচ্ছিন্ন আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে।

এখন কথা হল, এই সমস্ত বিষয়গুলিই বর্তমানে CPN(M) প্রস্তাবিত 'প্রকল্প সমূহ'; আগামী দু'বছর ধরে দেশের সংবিধানে যা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তারা সংসদের ভেতরে ও বাইরে লড়াই চালাবে। এই অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজটি যেমন সহজ হবে না, তেমনি যেটুকু দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে কার্যকরী করাটা হবে আরও কঠিন। কারণ প্রতিমুহূর্তেই এক্ষেত্রে CPN(M) -কে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিগুলির রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে, যারা বর্তমানের নেপাল রাষ্ট্রকে বড়জোর একটা বুর্জোয়া সংসদবাদের চৌহদ্দিতেই আটকে রাখতে সম্মত, তার বেশি কিছু নয়।

সুতরাং সেই বিচারে, উল্লিখিত অ্যাজেন্ডাগুলির মধ্যে সম্ভবত চতুর্থটিই আগামীদিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে— নীচুতলার সংখ্যাগুরু ও নিপীড়িত মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। এই ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া যে যে মাত্রায় ত্বরান্বিত ও কার্যকরী হবে, সংসদ-ও সেই সেই মাত্রায় 'বাধ্য' হবে ঠিক লাইনে হাঁটতে, রাষ্ট্রের চরিত্রও ঠিক সেই মাত্রায় বুর্জোয়া সংসদবাদের 'উপরে উঠতে' সক্ষম হবে। অন্যথায় নয়। এ'প্রসঙ্গে অন্য একটি সমস্যার দিকও আছে। উল্লেখিত চারটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং নেপালী জনতার জীবনযাত্রার সার্বিক উন্নয়ন-এর প্রশ্নে নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলি কি হবে, CPN(M) তার প্রস্তাবিত কর্মসূচীতে কিছুটা পর্যন্ত তা নির্দিষ্ট করেছে। উদাহরণ হিসাবে প্রথম ক্ষেত্রে আমূল ভূমি সংস্কারের কর্মসূচী, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বৈদেশিক পুঁজির ব্যাপারে কঠোর হওয়ার নীতি, তৃতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত পরিষেবাকে মূলতঃ রাষ্ট্রের হাতে রাখার প্রচেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। নিশ্চিতভাবেই এই নির্দিষ্টকরণগুলি যথেষ্ট নয়। কিন্তু চতুর্থ বিষয়টির মূর্ত অনুশীলন বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোয় ঠিক কিভাবে হবে, সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ছবি এখনও CPN(M) তৈরীই করতে পারেনি—যা নিঃসন্দেহে খুবই চোখে পড়ার মতো। সম্প্রতি, একটি সাক্ষাৎকারে কমঃ ভট্টরাইকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "নীচুতলা থেকে মানুষ যাতে চাপ দিতে পারে, সেটা নিশ্চিত করার জন্য আপনারা কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?" কমঃ ভট্টরাই-এর উত্তরটি এ'প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ—

> "প্রথমতঃ, আমাদের পার্টি এটা স্বীকার করে যে, বর্তমান সরকারে আমরা অংশগ্রহণ করলেও এই সরকার পুরোপুরি বিপ্লবী সরকার নয়, এটা একটা উৎক্রান্তিকালীন সরকার। সুতরাং অন্যান্য শ্রেণিগুলির সঙ্গে আমাদের আপোস (compromise) করে চলতে হবে। কিন্তু আমরা চাইব নেতৃত্ব দিতে। রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে বদলে দেওয়াটাই হবে আমাদের লক্ষ্য। তার জন্যেই বাইরে থেকে চাপ দেওয়াটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। যে কারণেই আমাদের পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সকলে সরকারে যোগ দেবে না। একটা অংশ সরকারে যোগ দেবে, অন্য একটা অংশ সরকারের বাইরে থেকে জনগণকে ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত করবে, সমাবেশিত করবে। যাতে পার্টি ঠিক রাস্তাটা ধরে চলতে পারে। আমাদের মধ্যে অনেকেই সরকারে থাকবো। আমাদের লড়াইয়ের মূল রূপটা হবে সরকারের মধ্যে থেকে, একটা নতুন সংবিধান তৈরীর লক্ষ্যে। কিন্তু একই সঙ্গে নেতৃত্বের একটা অংশ আবার সরকারের বাইরেও থাকবে। সেই কারণেই আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সকলে নির্বাচনে দাঁড়ায়নি। আমরা জনগণকে সংগঠিত এবং সমাবেশিত করতে চাই, যাতে তারা সরকারের ওপর চাপ বজায় রাখতে পারে। সুতরাং এটা একটা দিক। এবং এটার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানও আমরা তৈরী করতে চাই। যদিও এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপটাকে আমরা এখনও নির্দিষ্ট করে উঠতে পারিনি, কিছু নীতিগত ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। যখন আমরা একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্রের বিকাশের ধারণাকে সামনে রাখি, আমাদের স্লোগান ছিল, সরকার এবং পার্টিকে সবসময় জনগণের নজরদারীতে থাকতে হবে, প্রয়োজনে জনগণ যাতে (সরকার ও পার্টির ব্যাপারে) হস্তক্ষেপ করতে পারে, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। এটাই আমাদের নীতি। কিন্তু এটার মূর্ত-রূপকে আমরা এখনও নির্দিষ্ট করে উঠতে পারিনি। সরকার যদি বিচ্যুত হয়, তাহলে জনগণ সেখানে কিভাবে হস্তক্ষেপ করবে? প্রকাশ্য মিটিং-মিছিল করা ছাড়া, চাপ দেওয়ার জন্য আর কি কি তারা করতে পারে? রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই বা জনগণ হস্তক্ষেপ করবে কি করে? সেই পদ্ধতিগুলোই আমরা কার্যকরী করার চেষ্টায় রয়েছি।"[৭]

অর্থাৎ, 'জনগণের ক্ষমতায়ন' সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট ছবি, কোনও মূর্ত অনুশীলনের পরিকল্পনা এই মুহূর্তে পার্টির কাছেও স্পষ্ট নয়, অথচ বর্তমান নেপালের রাষ্ট্রচরিত্র নির্মাণে এই বিষয়টিই যে অন্যতম নির্ধারক ভূমিকা পালন করতে পারে, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। এ'প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক জনযুদ্ধের সময় বিপ্লবী জনতার বিকল্প ক্ষমতার আধার হিসাবে URPC (ইউনাইটেড রিভলিউশনারি পিপল্‌স কাউন্সিল) নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল, যা বস্তুত সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা চালানোর কাজে জনগণকে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করানোর একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করতো। বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে ১২ দফা চুক্তির পর এবং বিশেষ করে সংবিধান সভা নির্বাচনের পর এই উদ্যোগটি থেকে CPN(M) সরে আসে। নিজের তৈরি করা সরকারেই এই সমান্তরাল শাসন-ব্যবস্থা চালানোর মাধ্যমটিকে টিকিয়ে রাখতে গেলে CPN(M) হয়তো সমস্যায় পড়তো। কিন্তু নতুন সরকারে প্রত্যক্ষভাবে শাসন ব্যবস্থা চালানোর কাজে জনতার সক্রিয় অংশগ্রহণ, যদি URPC-র থেকে নীচু মাত্রায় হয় (এবং সেটিই যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই), তাহলে অন্তত এই ক্ষেত্রে CPN(M) দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপটি পশ্চাদ্‌গতিকেই চিহ্নিত করছে না কি? অন্তত জনগণের সক্রিয়তাকে ধারণ করা তথা ক্রমাগত তাকে বিকশিত করে তোলার প্রশ্নে? 'জনগণের ক্ষমতায়ন' সম্পর্কে যে পার্টি সজাগ, তার কাছ থেকে এই প্রশ্নে নীরবতা সত্যিই বেশ পীড়াদায়ক।

অর্থাৎ, সমগ্র আলোচনাটিকে একত্রিত করলে যে দুটি মূল যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি, তা হল ১। নির্বাচন পূর্ববর্তী পর্যায়ে সশস্ত্র জনযুদ্ধের পথ থেকে গণআন্দোলনের পথে CPN(M)-এর সরে আসার ঘটনাটিকে যেমন এক কথায় 'বিচ্যুতি' বলে স্ট্যাম্প মেরে দেওয়া যায় না, অন্ততঃ যতক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্র ও গণমুক্তি ফৌজের ওপর নিয়ন্ত্রণ পার্টির হাতছাড়া না হচ্ছে, ঠিক তেমনি ২। ২০০৭-এর 'অন্তবর্তীকালীন সরকার'-এ এবং ২০০৮-এর নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটি নির্বাচিত সরকারে যোগদান করার ঘটনাটিকেও এককথায় একটি 'সংশোধনবাদী পদক্ষেপ' বলে বর্ণনা করা চলে না, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা সত্যি সত্যিই একটি 'উৎক্রান্তিমূলক' অবস্থায় থাকছে। দশ বছরের ঐতিহাসিক জনযুদ্ধ, এপ্রিল গণআন্দোলন, রাজতন্ত্রের পতন এবং সর্বোপরি নির্বাচনে CPN(M)-এর বিপুল ভোটে জয়লাভ—পরপর এতগুলি ধাক্কায় নেপালের সাবেকি রাষ্ট্রব্যবস্থা যে এই মুহূর্তে বেশ কিছুটা নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈপ্লবিক কোনও পরিবর্তন ঘটেনি এ'কথা যেমন ঠিক, আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় সামন্তপ্রভু ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ যে ঠিক এই মুহূর্তে একেবারে আগের মতই আছে, তা-ও নয়। এমতাবস্থায় অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রেখে সরকারে অংশগ্রহণ, CPN(M)-এর পক্ষে একটি কার্যকরী রণকৌশলও হয়ে উঠতে পারে, অবশ্যই যদি কেবল 'নয়াগণতন্ত্রের নীচে' নয়, 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ওপরে' একটি রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের উদ্যোগ পার্টির দিক থেকে সচেতনভাবে জারি থাকে। এবং যেটা শুধু কথায় নয়, কাজেও করে দেখাতে হবে। আমাদের যেটা খেয়াল রাখা প্রয়োজন, এই বিষয়টিতে কিন্তু CPN(M) এখনও পর্যন্ত উল্লেখ করার মত কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। আমূল ভূমি সংস্কারের স্লোগান পার্টির দলিলে থাকলেও সরকারীভাবে সেই কর্মসূচী এখনও গৃহীত হয়নি। বৈদেশিক পুঁজির ব্যাপারে পার্টি 'কঠোর' হওয়ার নীতির কথা বললেও সরকার এখনও পর্যন্ত এ'প্রশ্নে কোনও স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে উঠতে পারেনি। বস্তুত বৈদেশিক পুঁজি নেওয়া, না নেওয়া অথবা শর্তাধীনে নেওয়া—ইত্যাদি প্রশ্নে খোদ পার্টিকেই বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে দিশাহীন বলে মনে হচ্ছে। ব্যক্তিপুঁজির ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে, অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে হলেও, নিদ্ধারিক হিসাবে ঘোষণা করার কাজে এখনও পর্যন্ত পার্টি দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। পরিশেষে, 'জনগণের ক্ষমতায়ন; বিষয়টিকে সরকারীভাবে কার্যকরী করে তোলাটা তো অনেক পরের কথা, এ'বিষয়ে পার্টি তার নিজের গাইডলাইনটিই এখনও স্পষ্টভাবে নির্মাণ করে উঠতে পারেনি। সব মিলিয়ে, 'বুর্জোয়া সংসদবাদের ওপরে' একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা নেপালের বুকে কায়েম করার বিষয়টি কিন্তু এখনও ধোঁয়াশাচ্ছন্ন অবস্থাতেই রয়েছে। আর আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ঐতিহাসিকভাবেই এই ধরণের পরিস্থিতি কখনও কোনও দেশে দীর্ঘয়িত হতে পারে না। দ্রুতই পাল্লা ঝুঁকে পড়বে কোনও একটি পক্ষে, হয় বিপ্লব, নয়তো প্রতিবিপ্লব।

### নতুন নেপাল তথা 'উৎক্রান্তিমূলক রাষ্ট্র': কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

নির্বাচন উত্তর পরিস্থিতিতে, CPN(M), 'নতুন নেপাল' গঠনের এক কর্মসূচীকে জনপ্রিয় আকারে সাধারণ মানুষের সামনে হাজির করছে। তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে, একটি 'উৎক্রান্তিমূলক রাষ্ট্রের' যা কর্মসূচী হওয়া উচিত বলে তাঁদের অভিমত, সেটিকেই তাঁরা জনপ্রিয় করতে চাইছেন 'নতুন নেপাল' গঠনের স্লোগানের মধ্যে দিয়ে। এ'বিষয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও পর্যবেক্ষণ এবার আমরা রাখার চেষ্টা করবো।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে 'উৎক্রান্তিকালীন' শব্দটির অর্থ হল একটি স্তর থেকে অন্য একটি স্তরে উত্তরণের মাঝামাঝি একটি পর্যায়, যার গতি সামনের দিকে। নেপাল রাষ্ট্রের চরিত্র কি ছিল? CPN(M)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা ঔপনিবেশিক। নেপাল রাষ্ট্রের চরিত্র কি হবে? CPN(M) নেতৃত্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জনগণতান্ত্রিক বা নয়াগণতান্ত্রিক, যার পরিণতি হবে সমাজতন্ত্রে। এ'বিষয়ে আবারও কমঃ ভট্টরাইয়ের কিছু বক্তব্যে আমরা চোখ রাখতে পারি—

> ".....আমরা চাই শান্তি, সুস্থিতি এবং প্রগতি, এবং তার জন্যে যাবতীয় সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে নির্মূল করার কাজে শ্রমিকশ্রেণি নেতৃত্ব দেবে—এবং, আমরা সমাজতন্ত্রের দিশায় পরিচালিত শিল্পসম্পর্ক বিকশিত করব, যা শ্রমিকশ্রেণির দূরায়ত দাবিগুলির মীমাংসা করবে।"[৮]

অন্যত্র, এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—

> "হ্যাঁ, আমাদের পার্টির দেওয়া 'নতুন নেপাল' স্লোগানটা নির্বাচন পর্যায়ে খুবই কার্যকরী হয়েছে। 'নতুন নেপালের জন্য নতুন চিন্তা ও নতুন নেতৃত্ব'—এই ছিল আমাদের মূল স্লোগান, এবং আমার ধারণা, মানুষ এটাকে বেশ ভালোভাবে গ্রহণ করেছে, ফলে আমাদের ভোটও দিয়েছে। সুতরাং নতুন নেপাল বলতে, প্রথমতঃ রাজনৈতিকভাবে আমরা যেটা বোঝাতে চাইছি, সমস্ত ধরণের সামন্ততান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের আমরা অবসান ঘটাবো। নতুন নেপালের এটা একটা দিক। অন্য দিকটি হল প্রগতির পথে নেপালের আর্থসামাজিক অবস্থার আমূল রূপান্তর ঘটানো। একটি দিক হল পুরানোকে ধ্বংস করা, অন্য দিকটি হলো নতুনকে গড়ে তোলা। দুটো দিক আছে। এবং আমাদের মূল জোরটা থাকবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে: কৃষিব্যবস্থার আমূল রূপান্তর, অতঃপর উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ, শিল্প সম্পর্ক—যাতে করে শ্রমিক এবং যুবকদের যথাযথ কর্মসংস্থান হয়। এবং ভবিষ্যতে সেটাই সমাজতন্ত্রের ভিত্তিভূমি রচনা করবে। আমাদের অর্থনৈতিক স্লোগানে আমরা 'নতুন উৎক্রান্তিমূলক অর্থনৈতিক পলিসি'র কথা বলেছি। এর মানে হলো শিল্প পুঁজিবাদ—শিল্প পুঁজির বিকাশ—যার দিশা পরিচালিত হবে সমাজতন্ত্রের দিকে। অন্তবর্তীকালীন পর্যায়ে এটাই আমাদের কাজ।"[৯]

অর্থাৎ, রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেই নেপাল কম্যুনিস্ট পার্টির দায়িত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে না; তার লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। সেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য একদিকে যেমন সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনই প্রয়োজন শিল্পপুঁজির বিকাশ ঘটানো। এপর্যায়ে তাহলে ব্যক্তি পুঁজির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হবে? কমঃ ভট্টরাই বলছেন—

> "আমরা যখন বলছি সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ চাই, তখন তার মানে এটা নয় যে আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও উচ্ছেদ চাইছি। আমাদের ভাষায় বলতে গেলে, আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশটা হবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব-এর পথে। অন্যভাবে বললে, যৌথকরণ, সামাজিকিকরণ, রাষ্ট্রীয়করণ এক্ষুনি আমাদের অ্যাজেন্ডা নয়। যা আমরা বলতে চাইছি, তা হলো আমাদের মত একটি দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির দেশে রাষ্ট্রকে আরও সাহায্যকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা পালন করতে হবে। সঠিক অর্থনীতি ও করব্যবস্থা না থাকলে বৈদেশিক স্বার্থ প্রাধান্যকারী জায়গায় চলে যেতে পারে, সুতরাং ঘরোয়া বেসরকারী ক্ষেত্র ও মুক্ত বাজারকে সুরক্ষা দেওয়ার কাজে

রাষ্ট্রকে ভূমিকা পালন করতে হবে।”[১০]

অর্থাৎ, কমঃ ভট্টরাই-এর মতে, শিল্পক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে এই রাষ্ট্রের আচরণ থাকবে সহযোগিতামূলক। স্বাভাবিকভাবেই, বৃহৎ পুঁজির রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সেই মোতাবেক কম্যুনিস্ট পার্টির আচরণও হওয়া উচিত সহযোগিতামূলক! অথবা বড়জোর বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক! এই সাধারণীকরণ কি মার্কসবাদ সম্মত? আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, নেপালের বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামো ‘নয়াগণতন্ত্রের নীচে’ তো বটেই, কিন্তু ‘বুর্জোয়া সংসদবাদের ওপরে’ কতটা, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে যাচ্ছে। এই ধরণের একটি রাষ্ট্রব্যবস্থায়, বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক মুহূর্তে, প্রবল জনসমর্থনের জোয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে একটি কম্যুনিস্ট পার্টি, বৈপ্লবিক প্রস্তুতি বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রেখেই বুর্জোয়া সংসদীয় দলগুলির সঙ্গে কৌশলগতভাবে দু’বছর মেয়াদী একটি সরকারে অংশগ্রহণ করতেও পারে, কিন্তু তার জন্য যেটা নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, তা হল, এই সময়পর্বে অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্কটি ঠিক কিরকম হবে। শুধুই সহযোগিতামূলক? অথবা বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক? না কি, এই পর্বেই বরং নিজেদের কর্মসূচীর সঙ্গে বুর্জোয়া-সংসদীয় দলগুলির কর্মসূচীর দ্বন্দ্বকে পার্টি আরও তীক্ষ্ণ করে তুলবে, মানুষের কাছে প্রকট করে তুলবে? কমঃ ভট্টরাই বলছেন, তাঁরা শিল্প পুঁজিবাদের পক্ষে, শিল্প পুঁজির বিকাশের পক্ষে, যার দিশা পরিচালিত হবে সমাজতন্ত্রের দিকে। এখন প্রশ্ন হল, শিল্পপুঁজির বিকাশের দিশা সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালিত হতে পারে, পুরোদস্তুর পুঁজিবাদের দিকেও পরিচালিত হতে পারে, কোন্‌দিকে পরিচালিত হবে সেটা শেষতঃ নির্ভর করছে রাষ্ট্রক্ষমতায় কারা রয়েছে—বুর্জোয়া না শ্রমিকশ্রেণি—তার ওপর। নেপালের রাষ্ট্রক্ষমতা এখনও মূলতঃ বুর্জোয়া-সামন্তপ্রভুদেরই হাতে, CPN(M) নিজেই সেটা স্বীকার করে। যদি তর্কের খাতিরে এটাও ধরে নেওয়া যায় যে নেপালের বিশেষ পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে এই মুহূর্তে রাষ্ট্রকাঠামোর ওপর উভয়েরই কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ জারি রয়েছে, এক ধরণের একটা ‘দ্বৈত ক্ষমতা’ তৈরী হয়েছে (এমনটা যে হওয়া অসম্ভব নয়, তা ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর রাশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে কমঃ লেনিন তাঁর ‘এপ্রিল থিসিস’ রচনায় তার উল্লেখও করেছিলেন), তাহলেও তো ‘শিল্প পুঁজির বিকাশ’ কে সমাজতন্ত্রের দিশায় পরিচালনা করার জন্য পার্টির এমন কিছু কর্মসূচী থাকবে, যা বুর্জোয়া দলগুলির থেকে মৌলিকভাবে পৃথক! সেই কর্মসূচী কোথায়? স্পষ্ট সেই কর্মসূচীর অনুপস্থিতিতে, সংসদীয় একটি ব্যবস্থায়, বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে সহাবস্থান, অন্য কোনও তাত্ত্বিক বিচ্যুতিকে সূচিত করছে না তো? এবিষয়ে আমাদের মতামত গঠন করার আগে, ২০০৬-এর ২৬ ডিসেম্বর, মাওবাদী পার্টি ও সংগঠনগুলির একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে তৎকালীন CPN(M)-এর কিছু বক্তব্যকে আমরা বিচারে রাখতে চাইবো। ‘একবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লব’ শীর্ষক এই সেমিনার পেপারে CPN(M) লিখেছিল:

“কোনও রাষ্ট্র ক্ষমতার অধীনে সমাজের পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন শ্রেণিগুলি সমান অধিকার ভোগ করতে পারে এমন মনে করাটা অবৈজ্ঞানিক এবং নির্বুদ্ধিতা। বস্তুত, ক্ষমতায় থাকা শ্রেণিটি গণতন্ত্র ভোগ করে আর বিরোধী শ্রেণিটির উপর একনায়কত্ব চালায়। তাই রাষ্ট্রক্ষমতা হচ্ছে দুই বিপরীতের, অর্থাৎ একনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের ঐক্য। বুর্জোয়া বা সর্বহারা যে শ্রেণিই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, কোনও শ্রেণিসমাজেই চরম গণতন্ত্র বা চরম একনায়কতন্ত্র থাকতে পারে না। যখন একনায়কত্ব ও গণতন্ত্র দুটোই শুকিয়ে যাবে তখন রাষ্ট্রক্ষমতার অস্তিত্ব থাকবে না এবং তার ফলে সমগ্র মানবসমাজ পৌঁছে যাবে এক শ্রেণিহীন সমাজে। তাই **ক্ষমতাসীন সর্বহারাকে** এমনভাবে গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব প্রয়োগ করতে হবে যাতে দুটোই শুকিয়ে যেতে পারে এবং শেষপর্যন্ত বিশ্বব্যাপী এক শ্রেণিহীন সমাজ স্থাপন করা যেতে পারে।

“**নিপীড়িত শ্রেণি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কিভাবে শত্রুর ওপর একনায়কত্বকে শক্তিশালী করতে পারে যাতে সাম্যবাদ অর্জন করা পর্যন্ত বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া যায় সেই বিষয়টিতেই আমাদের পার্টি গুরুত্বের সাথে মনোযোগ দিচ্ছে।** আমরা বিশ্বাস করি, যে নিপীড়িত শ্রেণিকে যত বেশি গণতন্ত্র দেওয়া যাবে, তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা ঐক্য তত বেশি শক্তিশালী হবে। **ফলস্বরূপ এটা সর্বহারার একনায়কত্বকে শক্তিশালী করতে পারে।** আমাদের বোঝাপড়া হচ্ছে এই যে অতীতে শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামগ্রিক গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার অভাব থাকার ফলে ক্ষমতার মধ্যে উদ্ভূত হতে থাকা আমলাতান্ত্রিক ঝোঁকের বিরুদ্ধে তাদের যৌথ লড়াই দুর্বল হয়ে পড়ে। এটা বস্তুত রাষ্ট্রক্ষমতা ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কটাকে করে ফেলেছিল আনুষ্ঠানিক, যেটা সংশোধনবাদীদের পক্ষে ক্ষমতাদখলের সুযোগ করে দেয়।.......

“....কিন্তু আমাদের শ্রেণি অতীতে যে গণতন্ত্রের অনুশীলন করেছে সেটা সর্বহারার একনায়কত্বকে শক্তিশালী করার বদলে আমলাদের বেড়ে ওঠার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পতাকাতলে ব্যাপক জনগণকে জমায়েত করে কমরেড মাও এই প্রক্রিয়াকে বিপরীতমুখী করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ততদিন তাঁর বিলম্ব ঘটে গিয়েছিল। আমরা যা মনে করি তা হচ্ছে অতীতে **সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে যে গণতন্ত্রের অনুশীলন হয়েছিল** সেটা এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছিল যেখানে সমাজের মধ্যেই সর্বহারা এবং নিপীড়িত শ্রেণি সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে গণ-কার্যকলাপের এক নিয়মিত প্রক্রিয়া করে তুলতে পারত। এ’কথা মাথায় রেখে আমাদের পার্টি একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের এক নতুন ধারণা গড়ে তুলেছে যাতে অতীতের হারানো সূত্রটাকে যুক্ত করা যায়।

“সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতন্ত্রের নানান ধরনের অভিজ্ঞতা অতীতে আমাদের হয়েছে। সর্বশেষে হচ্ছে চীনের অভিজ্ঞতা, যেখানে আমরা দেখি আটটি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি জনগণের সরকারে সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করতো। এদের কোনটাই শত্রুশ্রেণির পার্টি ছিল না। এই সম্পর্কটাকে জীবন্ত করে তোলার জন্য আমরা যেটা প্রস্তাব করছি তা হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কটাকে বহুদলীয় প্রতিযোগিতার স্তরে তোলা। **এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুমতি দেওয়া যাবে এমন রাজনৈতিক শক্তিগুলিকেই যারা সর্বহারার একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যাবে না।** বহুদলীয় প্রতিযোগিতার সাথে সাথেই আমাদের পার্টি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে জনগণের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ এবং প্রয়োজনে তাদের প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার অধিকার সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছে। এটা একদিকে যেমন জনগণকে সক্রিয় রাজনীতিতে আকৃষ্ট করার অন্যতম কার্যকর উপায় হতে পারে তেমনি অন্যদিকে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে যেখানে সর্বহারা নেতারা জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন। বস্তুত এটা জনগণের সাথে সর্বহারা নেতাদের শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নয়, বরং কমরেড সুলভ সম্পর্ক

গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক ভূমিকা পালন করবে।" (জোর আমাদের)[১১]

অর্থাৎ, **নিপীড়িত শ্রেণি ক্ষমতা দখলের পর, সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর,** গণতন্ত্রের কোন্‌ধরনের মডেল অনুশীলন করা উচিত, সে সম্পর্কে তৎকালীন CPN(M) তার মতামতকে এখানে স্পষ্ট করে রেখেছে। তার মতে, আমলাতন্ত্রের উত্থানকে ঠেকানোর জন্য **সর্বহারার একনায়কত্বের আধারেই** অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তিগুলির সঙ্গে **(যারা সর্বহারার একনায়কত্বকে মেনে নিয়েছে)** একটি 'বহুদলীয় প্রতিযোগিতা'য় কম্যুনিস্ট পার্টির নামা উচিত। বস্তুত, 'সমাজতন্ত্রের সংকট'কে কিভাবে মোকাবিলা করা যায়, আরও নির্দিষ্ট করে বললে, 'সমাজতন্ত্রের মধ্যে থেকেই উদ্ভুত আমলাতন্ত্রের সংকটকে' কিভাবে মোকাবিলা করা যায়, সে প্রশ্নে ২০০৩ সাল থেকেই নেপাল পার্টি এ'জাতীয় একটি তত্ত্বায়নে পৌঁছাতে থাকে, যা অবশ্যই মনযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। ২০০৩ সালের মে-জুন মাসে পার্টির সি সি, 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক দলিলে 'একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র' প্রসঙ্গে লিখেছিল—

"পরাজিত শ্রেণিশত্রুর ওপর একনায়কত্ব কায়েম করা এবং জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে মূল বাধা কি? **জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব বা সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে জনগণতন্ত্র বা সর্বহারা গণতন্ত্র মর্মবস্তুর দিক থেকে আচরণ সর্বস্ব, যান্ত্রিক এবং রক্ষণশীল হয়ে পড়ে কেন?** এই প্রশ্নের উত্তরে জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব বা সর্বহারা একনায়কত্বকে নিন্দা করে প্রচলিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাছে বিকিয়ে যাওয়া বিশ্বাসঘাতকদের বা সংশোধনবাদীদের দিকে আঙুল তোলার কিছু নেই। বরং প্রশ্নটি লাগাতার বিপ্লবকে সহজসাধ্য করে তোলার উপযুক্ত সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রক্ষমতাকে বিকশিত করে তোলার সঙ্গে যুক্ত। শেষ বিচারে এটি হল ব্যাপকতম ও সবচেয়ে সক্রিয় গণতান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি যা মূলগতভাবে জনগণের একনায়কত্ব বা সর্বহারা একনায়কত্বকে সংহত করে। এছাড়া মহান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অন্য কোন অর্থ হয় না। যে সকল পার্টি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আগে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সঠিক অনুশীলন করতে পেরেছিল, সেই পার্টিগুলিই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে সফল হবার পর কেন আচারসর্বস্ব গণতন্ত্র এবং আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার শিকার হয়ে পড়ে? পার্টিতে সংশোধনবাদীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এটা আলোচ্য প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত বলা যায় যে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগে মার্কসবাদীদের কোনো কোনো দুর্বলতাই তার জন্য দায়ী।

"**যেহেতু জনগণের মধ্যে নিহিত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সাথে শাসক পার্টির রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রয়োজন থাকে না, শাসক পার্টি ক্রমশ বিশেষ সুবিধাভোগী অধিযান্ত্রিক পার্টিতে এবং তার নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রও অধিযান্ত্রিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।** একইভাবে জনগণ আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের শিকার হয়ে পড়ে, আর তাদের অসীম সৃজনশীলতা ও সক্রিয়তা নিঃশেষ হয়ে যায়। ঐতিহাসিকভাবেই এই বিপদ পরিলক্ষিত হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য লাগাতার বিপ্লবের নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে জীবন্ত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করতে হবে এবং তার ওপর জনগণের পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা অনুসারে যেখানে পৌঁছানো গেল তা এই যে, শত্রুর বিরুদ্ধে একনায়কত্বের কার্যকরী ক্ষমতা জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র অনুশীলনের কার্যকারিতার ওপর নির্ভরশীল।

"এর জন্যই সামন্তবাদ বিরোধী-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনা করা দরকার, যাতে কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বহারাকরণ ও বিপ্লবীকরণ অব্যাহত রাখার মত পরিস্থিতি তৈরী রাখা নিশ্চিত হয়। কেবলমাত্র যদি পরিবর্ত বিপ্লবী পার্টি বা নেতৃত্ব স্থাপন করে তাদের হাতে রাষ্ট্রের ভার ন্যস্ত করার প্রশ্নে জনগণের অধিকার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়, তবেই পার্টি নিজেকে ক্রমান্বয়ে বিপ্লবীকরণে ব্যর্থ হলেও প্রতিবিপ্লবকে কার্যকরীভাবে রুখে দেওয়া যাবে।..." (জোর আমাদের)

অর্থাৎ, স্পষ্টতঃই, CPN(M) এখানে 'জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব বা সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে জনগণতন্ত্র বা সর্বহার গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে—'শ্রেণিশত্রুরা যেখানে পরাজিত'—অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনার কথা বলেছিল। 'সামন্তবাদ বিরোধী-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনা করা দরকার'—এই বাক্যাংশের আগে 'বিপ্লবের আগে' না 'বিপ্লবের পরে' তার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকলেও যুক্তিবিন্যাসের ধারাবাহিকতা থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বাধীন একটি রাষ্ট্র প্রসঙ্গেই কথাগুলো বলা হয়েছিল। এবং বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রেখেই বলা যায়, কথাগুলি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্যও বটে।

কিন্তু ২০০৩-এর এই তত্ত্বায়নের একটা বিপজ্জনক ব্যাখ্যা হঠাৎই আমরা দেখতে পেলাম ২০০৬-এ এসে! ২০০৬-এর মে মাসে প্রকাশিত '*দ্য ওয়ার্কার*' [CPN(M)-এর মুখপত্র]-এর একটি প্রবন্ধে কমরেড ভট্টরাই বললেন:

"... এই প্রসঙ্গে ২০০৩-এর মে-জুনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে চেয়ারম্যান প্রচণ্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত 'ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের বিকাশ'-এর ওপর দলিলটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। আমলতান্ত্রিক বিকৃতি প্রতিহত করা এবং নিরন্তর প্রলেয়ারীয়করণ চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পার্টি, সশস্ত্র বাহিনী এবং রাষ্ট্রের ওপর জনগণের তদারকি, হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যে পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, **বিপ্লবের আগে এবং পরে উভয়ক্ষেত্রেই, এবং তার জন্য বিশেষ একটি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে যে বহুদলীয় প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছিল,** তা নিঃ সন্দেহে প্রথাগত ধ্যান-ধারণা এবং পদ্ধতিকে ভেঙে দিয়ে একটি মহান চিন্তা। ...' (জোর আমাদের)[১৩]

**বিপ্লবের আগে এবং পরে উভয় ক্ষেত্রেই!?** কই, মূল দলিলে তো এমন কোনও নির্দিষ্টকরণ ছিল না! বরং যুক্তিবিন্যাস নির্দেশ করছিল একটি বিপ্লব-পরবর্তী ব্যবস্থার প্রতিই! তাছাড়াও, যে **বিশেষ সাংবিধানিক কাঠামোর** কথা সেখানে বলা হয়েছিল, সেখানেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, '**এ'বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুমতি দেওয়া যাবে এমন রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যেই যারা সর্বহারা একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যাবে না।**' নেপালি কংগ্রেস, ইউএমএল প্রভৃতি দলগুলি সম্পর্কে কি এই মূল্যায়ন প্রযোজ্য? এখানেই শেষ নয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬-এ প্রকাশিত বিবিসি নেটওয়ার্ক-এর একটি সাক্ষাৎকারে চার্লস হ্যাভিল্যান্ড ও কমঃ প্রচণ্ড'র কথোপকথন-এর প্রাসঙ্গিক একটি অংশ আমরা এ'বার উদ্ধৃত করছি:

“প্র: আপনি কি বহুদলীয় ব্যবস্থায় বিশ্বাসী অথবা আপনি কি চান যে ভবিষ্যতের কোনও এক সময় আপনাদের পার্টি নেপালে এককভাবে শাসন চালাবে?

উ: এ'প্রশ্নটি আমি খুব গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করতে চাইছি। তিন বছর আগে, আমাদের পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির এক সভায়, বিংশ শতাব্দীর কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে, আমরা গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য একটা প্রস্তাব রেখেছিলাম।

একবিংশ শতাব্দীতে বিংশ শতাব্দীর মত রাষ্ট্র আমাদের কাছে আর নেই। তাই আমাদের সেন্ট্রাল কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের বিকাশের ওপর এই লেখাটি পাশ করেন। এই লেখাটির প্রকৃত অর্থ হল সামন্ততন্ত্র এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকবে এবং স্বাভাবিকভাবেই বহুদলীয় প্রতিযোগিতা থাকবে।

তখন থেকে আমরা বলে আসছি যে যতদিন পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট সাংবিধানিক ধারার বলে বহুদলীয় প্রতিযোগিতা থাকবে, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

তিন বছর আগে এই দলিলটি খুব স্পষ্টরূপে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে চুক্তিতে আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছি যে আমরা বহুদলীয় প্রতিযোগিতায় সম্মত আছি। বিশ শতকে আমরা যা দেখেছি এবং বিশ শতকের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি, তার একটা বড় প্রশ্ন হল গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রকে বুঝতে গেলে এ'বিষয়ে আমাদের এক নতুন চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং আমরা, এতে উত্তীর্ণ হয়েছি।”[১৪]

স্পষ্টতই, ২০০৩-এর দলিলে 'বহুদলীয় প্রতিযোগিতা' সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল এবং ২০০৬ সালে কমঃ প্রচণ্ড তার সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ হাজির করলেন, সে'দুটির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে! ২০০৩-এ 'বহুদলীয় প্রতিযোগিতা'র প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণি কর্তৃক ক্ষমতাদখল তথা বিপ্লব-উত্তর একটি রাষ্ট্রব্যবস্থায় কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে থেকেই আমলাতন্ত্রের উত্থানকে প্রতিহত করার পরিপ্রেক্ষিতে; আর ২০০৬-এ বিষয়টিকে উপস্থাপিত করা হল সম্পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতবিহীন ভাবে, একটি সাধারণ কর্মসূচীর মত করে! ২০০৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসেই 'দ্য হিন্দু' পত্রিকাকে দেওয়া কমঃ প্রচণ্ড'র অন্য একটি সাক্ষাৎকারেও একই অসঙ্গতি চোখে পড়ে:

“প্র: আজকাল আমরা একটা প্রবাদ শুনি, 'মাওবাদীরা প্রথমে ঘাড়ে চেপে বসবে, তারপর মাথায় আঘাত করবে'। এর মানে কি এ'টা, যে অন্যান্য পার্টির সঙ্গে আপনাদের জোট নীতিগত নয়, বরং কৌশলগত? অর্থাৎ মাথা—মানে রাজতন্ত্র—যখন দুর্বল হয়ে পড়বে বা পরাজিত হবে, তখন আপনারা ঘাড় থেকে আঘাত হানবেন?

উ: তা নয়। বহুদলীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তটি হল একটি নীতিগত ও তাত্ত্বিকভাবে বিকশিত অবস্থান; অর্থাৎ একটি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে, গণতন্ত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটা একটা কথা। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সিদ্ধান্ত কোনও কৌশল নয়। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পলিসি। আমরা পার্টিগুলিকে বলছি, যে শুধু স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকেই নয়, খোদ রাজতন্ত্রকেই খতম করতে হবে। বীরেন্দ্রর আমলের মত শুধু প্রথাগত রাজতন্ত্রই নয়, আমাদের এটাকে পুরোপুরি শেষ করে দিতে হবে। তারপর যে বহুদলীয় গণতন্ত্র আসবে—অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, সাংবিধানিক সভা এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র—তাতে আমরা সকলের সঙ্গেই শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা চালাতে প্রস্তুত।...”[১৫]

সাক্ষাৎকারটি খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায়, 'বহুদলীয় গণতন্ত্র'-র বিষয়টি যে একটি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে তত্ত্বায়িত হয়েছিল, সেই উল্লেখ অস্পষ্টভাবে করলেও পরবর্তীতে নেপালের তৎকালীন পরিস্থিতিতে অনুশীলনটির সাধারণীকরণ করেছেন কমঃ প্রচণ্ড। যা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর! আর ২০০৬-পরবর্তীতে, বিশেষ করে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হওয়ার পর, নেপালের রাষ্ট্রচরিত্র সম্পর্কে এবং তদনুযায়ী পার্টির আশু কর্মসূচী স্থির করা নিয়ে বড় সড় বিভ্রান্তি যে পার্টির মধ্যে ছিলই, গত কয়েক মাসে তা পরিষ্কারও হয়ে গেছে। পার্টির মধ্যে এ'প্রশ্নে বিতর্ক, বিভিন্ন অবস্থান ইত্যাদি প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের শেষভাগে আমরা আলোচনা করবো। আপাততঃ অন্তত এ'টুকু বলা যেতে পারে, বৈপ্লবিক প্রস্তুতি বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে ঢিলে-ঢালা, অ-সংহত একটি রাষ্ট্রকাঠামোয় অন্যান্য সংসদীয় দলের সঙ্গে কৌশলগতভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টি যদি 'বহুদলীয় গণতন্ত্রে' সাময়িকভাবে অংশগ্রহণ করার কথা ভাবে, তাহলে নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে সেই রণকৌশল সমর্থনযোগ্য হতেও পারে; কিন্তু 'বহুদলীয় গণতন্ত্রে' অংশগ্রহণ যদি বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট দিশাবিহীন একটি সাধারণ কর্মসূচী হয়, অনির্দিষ্টকালীন কর্মসূচী হয়, অবশ্যই তা অনুমোদনযোগ্য নয়। অন্যান্য বহু প্রশ্নে বিতর্ক থাকলেও, এই প্রশ্নে অন্ততঃ ভারতের মাওবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সমালোচনার সঙ্গে আমরা অনেকটাই একমত। ২০০৬-এর উল্লিখিত দুটি সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ভারতের মাওবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সমলোচনা ছিল—

> “এখানে শব্দ নিয়ে তালগোল পাকানোর ব্যাপার নেই। CPN(M)-এর নেতা মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া সামন্তবাদী সংসদীয় পার্টিগুলিকে সরাসরি নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর পার্টি এদের সক্কলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা চালাতে রাজী। আর বহুদলীয় গণতন্ত্রের সিদ্ধান্তটিকে রণনীতিগত ও তত্ত্বগতভাবে বিকশিত অবস্থান হিসাবে নির্দেশিত করে কমঃ প্রচণ্ড এক বিপজ্জনক তত্ত্বকেই হাজির করেছেন। এ তত্ত্ব আসলে বিপ্লবের দ্বারা শাসকশ্রেণির পার্টিগুলিকে উচ্ছেদ করার বদলে তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের; তথাকথিত সংসদীয় নির্বাচনে সাম্রাজ্যবাদ এবং বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের পোঁ ধরা শাসকশ্রেণির পার্টিগুলি সমেত অন্যান্য সংসদীয় পার্টিগুলির সাথে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা; অনির্দিষ্টকালের জন্য সমাজতন্ত্র নির্মাণের লক্ষ্য বর্জন করা এবং সামন্তবাদী মুৎসুদ্দি প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্য ক্ষমতায় আসীন হওয়ার দরজা হাট করে খুলে দেওয়ার তত্ত্ব; আর এর ফলে, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ধুয়ো ধরে, দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের বা বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া শক্তির ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ও জনগণের পিছিয়ে পড়া অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে তারা ক্ষমতায় আসীন হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবেই আর সমাজবিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়া সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ অভিমুখী হয়ে পড়বে। সামগ্রিকভাবে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রসঙ্গে কমঃ প্রচণ্ড'র সিদ্ধান্ত, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সংবিধান সম্পর্কে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরী করবে।”[১৬]

অবশ্য এই সমালোচনার পর-পরই তাঁরা আবার 'দৃঢ়ভাবে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পথকে আঁকড়ে না ধরাই CPN(M)-এর অবস্থান পরিবর্তনের জন্য দায়ী' বলে অতিসরল এক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন! তাঁদের বক্তব্য—

> “...দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের নীতিতে দৃঢ় না থাকা এবং দ্রুত বিজয় লাভের ইচ্ছার ফলে, অবিরাম যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে শত্রুকে অবসন্ন করে তোলা, নিজের ক্ষমতাকে ক্রমশ আরও বাড়িয়ে নেওয়া এবং শত্রুকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে সুযোগ মত রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার

দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তুতির কথা CPN(M) ভাবতে পারেনি। ভুলবশত পার্টি এটাই ভাবে যে, জনযুদ্ধ যত দীর্ঘ সময় ধরে চলবে, বিপ্লবীদের পক্ষে পরিস্থিতি ততই প্রতিকূল ও কঠিন হয়ে পড়বে, কেননা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ভারতের সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ অবধারিত।...

... দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের রণনীতি সম্পর্কে যদি গভীর ও সম্যক বোধ থাকত, তাহলে CPN(M) আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারতো, বহির্দেশীয় সামরিক হস্তক্ষেপের মোকাবিলা কিভাবে করা সম্ভব, আর সে যুদ্ধকে জাতীয় যুদ্ধে পরিণত করে কিভাবে সেই যুদ্ধের মাধ্যমেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব।..."

বস্তুত, ভারতের মাওবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির এই বক্তব্যে আবার, চীনা মডেলের বিপ্লবের যতটা যান্ত্রিক প্রতিফলন রয়েছে, নেপালের মূর্ত পরিস্থিতির মূর্ত বিশ্লেষণের দ্বান্দ্বিক প্রয়াস ততটা নেই বলেই মনে হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে বিপ্লবের একটি সাধারণ পথনির্দেশ থাকবে, এ'কথা যেমন সত্যি, তেমনি প্রতিটি দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং সমকালীন পরিস্থিতিকেও প্রতি মুহূর্তে বিচার রাখা প্রয়োজন। রণনীতিগত প্রশ্নে অনড় থেকে পরিবর্তনশীল রণকৌশলের প্রাসঙ্গিকতাও তো সেখানেই। 'প্রাসাদ হত্যাকাণ্ড'-এ রাজা বীরেন্দ্র'র মৃত্যুর পর রাজা জ্ঞানেন্দ্র'র সিংহাসনে বসা—চরম স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালানোর মধ্যে দিয়ে প্রায় সমস্ত সংসদীয় দলকে বৈরীতামূলক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া—দেশজোড়া প্রবল রাজবিদ্বেষের বাতাবরণ তৈরী হওয়া—তারই পরিণতিতে এবং দশবছরের জনযুদ্ধের অভিঘাতে পরিপক্ক হয়ে ওঠা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে এপ্রিল গণআন্দোলন—অন্তর্বর্তী সরকার গঠন—বহু টালবাহানা করেও অবশেষে রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণায় সংসদীয় পার্টিগুলোর একরকম বাধ্য হওয়া—এবং পরিশেষে কনষ্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলী নির্বাচন ও CPN(M)-এর বিপুল ভোটে জয়লাভ, এ'সবই নেপালের মূর্ত ও বিশেষ পরিস্থিতি, বিপ্লবের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রণকৌশলকে যার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হতে হবে। অস্ত্রের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখার পাশাপাশি, এমতাবস্থায় একটি কম্যুনিষ্ট পার্টি কেন সাময়িকভাবে সরকারে গিয়ে নিজেদের কর্মসূচীর জোরে সংসদীয় দলগুলির স্বরূপ উন্মোচণের চেষ্টা করবে না, কেন আইনী সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আরও বড় সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি নেবে না (যেমনটা অতীতেও তারা নিয়েছিল সংসদে অংশগ্রহণ করে), তার কোনও ব্যাখ্যা ভারতের মাওবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বক্তব্যে আবার অনালোচিতই থেকে গেছে। ভারতের মাওবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে এখানেই আমাদের বিশ্লেষণের একটা তফাৎ ঘটবে। বর্তমান পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করে আমাদের ধারণা, সরকারে গিয়েও, নেপালের বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর এক চমৎকার সম্ভাবনা CPN(M)-এর হাতে রয়েছে। অবশ্যই তার জন্য আবার সঠিকভাবে বর্তমান নেপালের রাষ্ট্রচরিত্রকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, বিভিন্ন শ্রেণিগুলির শক্তির ভারসাম্যকে খুঁটিয়ে বিচার করা প্রয়োজন এবং তদনুযায়ী, 'গণমুক্তি ফৌজ'-এর নিয়ন্ত্রণকে নিজের হাতে রেখেই পার্টির প্রয়োজন আশু ও দূরাগত কর্মসূচীগুলি চূড়ান্ত করা। এ'প্রসঙ্গে নেপাল পার্টির মধ্যে যে কিছু বিরোধ-বিতর্ক আছে, সে'কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সেই বিতর্কগুলিরই একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা হাজির করে এবং সে'সম্পর্কে আমাদের কিছু প্রাথমিক অবস্থান নির্ণয় করে বর্তমান প্রবন্ধটি আমরা শেষ করবো।

**নেপাল পার্টির মধ্যেকার বিতর্ক ও তার বর্তমান সমাধানসূত্র:**

কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলী নির্বাচনে 'সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল' হিসাবে জিতে এসে সরকারে যোগদান করার পর, বেশ কিছু প্রশ্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য নেপাল পার্টির মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করে। সরকারীভাবে রাজতন্ত্র অপসৃত হয়েছে। নেপালী মেহনতী জনতার দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ঘোষিত হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। অতঃপর কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজ কি হবে? নবগঠিত রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র-কেই বা ঠিক কিভাবে বিশ্লেষণ করা হবে? অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পর্ক-ই বা কি রকম হবে? ২০০১-এর দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে ঐতিহাসিক জনযুদ্ধ চলাকালীনই পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, রণকৌশলগত স্লোগান হিসাবে 'রাজতন্ত্রকে' উচ্ছেদ করে 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' গঠনের দাবিকে সামনে আনা হবে; রাজতন্ত্রই যেহেতু নেপালী জনতার মূল শত্রু, কাজেই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে অন্যান্য বুর্জোয়া-সংসদীয় দলগুলির সঙ্গে সংগ্রামের যৌথ মঞ্চ গড়ে তুলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ও সংবিধান সভা নির্বাচনের দাবিকে জনপ্রিয় করা হবে। রণকৌশলগত এই কর্মসূচীকেই আরও নির্দিষ্ট করে ২০০৫-এর 'চৌনওয়াং মিটি'-এ পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, "পার্টি এমন এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চায়, যা চরিত্রের দিক থেকে বুর্জোয়া সংসদীয় প্রজাতন্ত্র-ও নয়, আবার নয়াগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-ও নয়। এই প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্রক্ষমতাকে বহুলাংশে পুনর্গঠিত করার সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন বহুদলীয় প্রজাতন্ত্রের ভূমিকা পালন করবে, যা শ্রেণি-জাতীয়-আঞ্চলিক ও লিঙ্গ সমস্যাগুলিকে মীমাংসা করার চেষ্টা করবে।" ঘটনাচক্রে, এ'সবই এখন অর্জিত হয়েছে। যা ছিল গতকালের 'দাবি', 'রণকৌশলগত স্লোগান'— রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সংগ্রামের যৌথমঞ্চে নিয়ে আসা, রাজতন্ত্র-কে উচ্ছেদ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন, সংবিধানসভা নির্বাচন—সবই, নানান উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে হলেও আজকের অর্জিত বাস্তব। অসংখ্য নেপালী জনতা, রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে যেমন প্রাণ দিয়েছে, তেমনি আবার, প্রবল প্রত্যাশা নিয়ে অন্যান্য সংসদীয় দলগুলির সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও ভোট দিয়ে সরকারে পাঠিয়েছে, সংবিধান সভায় নির্বাচিত করে 'নতুন নেপাল'-এর সংবিধান লেখার ভার দিয়েছে। এ'বার পার্টি কি করবে? যা তৈরী হল,যা তৈরী করার জন্য একসময় জনতাকে পার্টি আহ্বান জানিয়েছিল (এবং জনগণের তৎকালীন চেতনার স্তর অনুযায়ী ও সার্বিক পরিস্থিতির বিচারে যে আহ্বান মূলতঃ সঠিক-ই ছিল), তাকেই আরও সংহত করা, বিকশিত করার কাজে পার্টি মননিবেশ করবে? নাকি, রণকৌশলগত স্লোগানকে আরও উন্নত করে চেতনার আরও উঁচু স্তরে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার নতুন এক কর্মসূচী হাতে নেবে? জটিল প্রশ্ন নিঃসন্দেহে। জনগণের চেতনা ও চাহিদার বর্তমান স্তরটিকে যদি বিচার করা হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে, 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' ও 'নয়াগণতন্ত্র' তথা 'নয়াগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'র তাত্ত্বিক বিতর্ক সম্পর্কে তাঁরা ততটা উৎসাহী নন, যতটা উৎসাহী শতাব্দী-প্রাচীন ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিষ্পেষণ-নিপীড়ন-এর আশু অবসানে। সেই কারণেই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই করেছেন। সেই কারণেই কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ভোটও দিয়েছেন। এ'বার স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা 'কাজ' চাইবেন। 'দ্রুত রিলিফ' চাইবেন। এবং তাঁদের এই 'চাওয়া'-র মধ্যে অন্যায়-ও কিছু নেই। প্রবল এই চাপের মুখে পড়ে পার্টি আবার চাইলে বেশ কিছু 'রিলিফ'-এর ব্যবস্থা করতেও পারে, কারণ সরকারে সে-ই সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। এবং সেটা করতে হলে তাকে অন্যান্য সংসদীয় দলগুলোর সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-ও চালাতে হবে, কারণ সরকারে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তার হাতে নেই। কিন্তু আবার, যত বেশি করে পার্টি সেই 'রিলিফ'-এর রাজনীতিতে ঢুকবে, 'সংস্কার'-এর রাজনীতিতে ঢুকবে, ততই আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা পড়তে থাকবে সংসদীয় চৌহদ্দীর ঘেরাটোপে। শেষতঃ যা

অতিক্রম করতে না পারলে আবার জনগণের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান কোনওমতেই সম্ভব নয়। এ'এক অদ্ভূত উভয়সঙ্কট! আশু সমস্যা নিরসনের কাজে মননিবেশ করলে— যার বাস্তব চাপও আকাশছোঁয়া—মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান ক্রমশঃ দূরে সরে যাবে; আবার মৌলিক সমস্যাবলী মীমাংসার দূরায়ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে গেলে দেখা যাবে এখুনি তাঁরা চেতনার সেই স্তরে নেই। অত্যন্ত জীবন্ত এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন-ই আমরা এ'পর্যায়ে প্রত্যক্ষ করলাম নেপালের কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে। তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এবার হাজির করবো।

২০০৮-এর ৪-৬ অক্টোবর, কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায়, কমঃ প্রচণ্ড, বর্তমান 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'-কেই (ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক) আরও সংহত করা ও বিকশিত করার স্বপক্ষে এক মৌখিক প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবের স্বপক্ষে যুক্তি ছিল, 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' গঠনের রণকৌশলগত স্লোগানটি যেহেতু সঠিক, এবং সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতিও যেহেতু তার চেয়ে উন্নত কোনও স্লোগানের উপযোগী নয়, কাজেই 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'-কেই আরও সংহত ও বিকশিত করার কর্মসূচী পার্টির গ্রহণ করা উচিত। সেই মোতাবেক, সরকার ও সংবিধান সভার মধ্যেই পার্টির মূল লড়াইকে কেন্দ্রীভূত করা, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী হাতে নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের ওপর তিনি মূল গুরুত্ব আরোপ করেন। এই প্রস্তাবকে বিরোধ করে কমঃ কিরণ একটি বিকল্প লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন, যার মূল বক্তব্য ছিল, 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'র রণকৌশলগত স্লোগানে আটকে না থেকে 'গণপ্রজাতন্ত্র' (পিপল্স্ রিপাবলিক) গঠনের উন্নত রণকৌশল পার্টির গ্রহণ করা উচিত এবং সমস্ত আশু কর্মসূচী চূড়ান্ত করা উচিত সেটির-ই ভিত্তিতে। তাঁর যুক্তি ছিল, 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' যখন অর্জিত হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতাও লাভ করেছে, তখন সংগ্রামকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে হলে আরও উন্নততর রণকৌশলগত স্লোগানকেই পার্টির গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং 'গণপ্রজাতন্ত্র' গঠনের আহ্বান জানানোই হল সেই উন্নততর স্লোগান।

স্পষ্টতঃই, এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রস্তাবের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য প্রবল। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বোঝাপড়া'র পার্থক্যও সুগভীর। 'সংবিধান সভা আহ্বান'-ই ছিল বিগত পর্যায়ে পার্টির মূল স্লোগান। সেই সভা এখন আহূত হয়েছে। অন্যান্য বুর্জোয়া সংসদীয় দলগুলির সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সেখানে একাসনে রয়েছে। এমতাবস্থায়, সর্বোচ্চ নেতৃত্বের একাংশ যখন একমাত্র সংবিধান সভাকেই লড়াইয়ের ভরকেন্দ্র করে তোলার বিরোধিতা করছেন, সেটির কার্যকারীতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এবং সেটির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সরব হচ্ছেন, কমঃ প্রচণ্ড তখন সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন,—

> "...সংবিধান সভায় আসল লড়াইটা সবে শুরু হয়েছে। এ'টাই তো আমাদের দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত রণকৌশলের মর্মবস্তু ছিল। সেই রণকৌশল শেষ হয়ে গেছে, এ'কথা বলার অর্থ হলো মানসিকভাবে নিজেদের নিরস্ত্র করে তোলা, শূন্য থেকে আবার শুরু করা। যা কেবল স্বপ্নকল্পই তৈরী করবে। প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচিত হওয়ার পর সংবিধান সভাই হল আসল জায়গা।..."[১৮]

নিঃসন্দেহে, এটি একটি গভীর মতপার্থক্য। যা অর্জিত হয়েছে, তাকে রক্ষা করার জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে, না কি, যা এখনও অর্জিত হয়নি; তা অর্জন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে অর্জিত সাফল্যকেও বাজী ধরে এগনো হবে! বিতর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু এককথায়, এখানেই। যাই হোক, আন্তঃপার্টি বিতর্কের এই পর্যায়ে পৌঁছে, CPN(M)-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেই বিতর্কটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করে একটি জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করা হয়। ২০০৮'এর ২১-২৭ নভেম্বর, সহস্রাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সংগঠিত হয় খারিপাতি কনভেনশন। এই কনভেনশনে, সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দুটি প্রস্তাবকেই পেশ করা হয়। প্রায় এক সপ্তাহ ব্যাপী তীব্র মতাদর্শগত বিতর্কের পর অবশেষে একটি সর্বসম্মত অবস্থানে পৌঁছতে সমর্থ হয় পার্টি। মূল যে দুটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা হল, ১) বর্তমান পরিস্থিতিতে, 'জনগণের যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক জাতীয় প্রজাতন্ত্র' (পিপল্স্ ফেডেরাল ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল রিপাবলিক) গঠনের স্লোগানকে মূল রণকৌশলগত স্লোগান হিসাবে সামনে রেখে পার্টি এগিয়ে চলবে, সংক্ষেপে যাকে 'গণপ্রজাতন্ত্র' (পিপল্স্ রিপাবলিক) বলা হবে; এবং ২) এই পর্যায়ে তিনটি ক্ষেত্রে পার্টি তার লড়াইকে কেন্দ্রীভূত করবে—রাজপথে, সংবিধান সভায় এবং সরকারে—যার মধ্যে প্রথমটি, অর্থাৎ রাজপথের লড়াই, মূল গুরুত্বে থাকবে।

খারিপাতি কনভেনশনের এই সিদ্ধান্তসমূহ কি কোনও রাজনৈতিক মেরুকরণের ইঙ্গিতবাহী? না কি, নিছকই একটি সমঝোতা সূত্র? কমপ্রোমাইজ ফর্মুলা? আমাদের বিচারে, এখনও শেষ কথা বলার সময় আসেনি। তবে এ'টুকু অন্তত বলা চলে, নেপালের কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের একাংশের দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম প্রবলভাবেই বর্তমান, যা কঠিন হলেও, নিঃসন্দেহে আশার সঞ্চারী। এ'প্রসঙ্গে, CPN(M)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেতৃত্ব, কমঃ সি.পি. গাজুরেল-এর সাম্প্রতিকতম একটি রচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে আমরা বর্তমান প্রবন্ধটির উপসংহার টানবো—

> "ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিটি বিপ্লবী পার্টির কাছেই রণনীতি ও রণকৌশলের প্রশ্নটি প্রবলভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটা সত্যি যে, বিপ্লবের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করার জন্য সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ শর্তাবলী, দুটিরই পরিপক্ক হয়ে ওঠা প্রয়োজন। কিন্তু এই দুটি শর্ত আপনাআপনি বিকশিত হয়ে ওঠে না, আমাদের হাতে এসেও পড়ে না। একটি বিপ্লবী পার্টির সচেতন ভূমিকাই কেবল এই শর্তাবলীকে বিপ্লবের পক্ষে বিকশিত করে তুলতে পারে। সঠিক নীতি ও কৌশল নির্ণয় করাটাই আবার এই সচেতন ভূমিকা পালনের চাবিকাঠি। একটি ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে রণনীতিগত অবস্থান অপরিবর্তিত থাকতে পারে। কিন্তু সেই রণনীতিগত বিজয় অর্জন করতে হলে আবার সঠিক রণকৌশলের প্রয়োজন। সুতরাং, কোন্ রণকৌশল একটা পার্টি অনুশীলন করছে, সেটা দিয়েই তার বিপ্লবী চরিত্রকে বোঝা যায়। রণকৌশলের সাফল্য-ব্যর্থতাই রণনীতির সাফল্য-ব্যর্থতাকে নির্ধারণ করে।
>
> আমাদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী—দু'ধরনের রণকৌশল আছে। পরিস্থিতির সামান্য পরিবর্তনের জন্যও স্বল্পমেয়াদী কৌশল পরিবর্তিত হতে পারে। লেনিন যখন বলেছিলেন, যে কৌশল কখনও কখনও ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও পরিবর্তিত হতে পারে, তখন তিনি সম্ভবতঃ এ'জাতীয় কৌশলের কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। বিপ্লবকামী প্রতিটি বিপ্লবী দলকেই পরিস্থিতির ছোট-খাট পরিবর্তনের ওপর নজর রাখতে হবে; যাতে শ্রেণিসংগ্রামের নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জের সে মোকাবিলা করতে পারে।
>
> ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পরিবর্তিত হতে পারে, এমন রণকৌশল ছাড়াও, আমাদের তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী কিছু রণকৌশলও গ্রহণ করতে

হবে, যাকে মূল রণকৌশল (মেজর ট্যাক্‌টিক্‌স) বলা যেতে পারে। এই মূল রণকৌশলকে কার্যকরী করার জন্য আবার অসংখ্য স্বল্পমেয়াদী রণকৌশলের প্রয়োজন হতে পারে। **আমাদের পার্টির দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে প্রজাতন্ত্র গঠনের দীর্ঘমেয়াদী রণকৌশল নেওয়া হয়েছিল, যেটাই আবার পুরানো রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সংসদীয় দলগুলির সঙ্গে আমাদের সাময়িক জোট গঠনের ভিত্তি নির্মাণ করেছিল**। ২০০৫ সালে সাতটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমাদের পার্টির '১২ পয়েন্টের এগ্রিমেন্ট' সেটারই এক নির্দিষ্ট উদাহরণ।

এপ্রিল ২০০৮-এ সংবিধান সভা নির্বাচনের পর এবং ৮ মে সেই সংবিধান সভার প্রথম বৈঠকে নেপালকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর, **পার্টির সেই দীর্ঘমেয়াদী রণকৌশলটি তার কাজ শেষ করে ফেলেছে**। এবং এইভাবেই, সেই দীর্ঘমেয়াদী রণকৌশলটি সাফল্যের সাথে প্রয়োগও করা হয়েছে।

রাজতন্ত্রের অবসানের আগে, নেপালী জনতার সঙ্গে সামন্ততন্ত্র, মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজির দ্বন্দ্ব-ই ছিল নেপালী সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব। ২৪০ বছরের প্রাচীন রাজতন্ত্রই ছিল মূল শত্রু। রাজতন্ত্রের অবসানের পর, প্রধান দ্বন্দ্বটির পরিবর্তন ঘটেছে। সামন্ততন্ত্রের জায়গায়, যা কিনা ছিল আগেকার প্রধান দ্বন্দ্বের মূল দিক, এখন মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিই মূল দিক হিসাবে সামনে চলে এসেছে। প্রধান দ্বন্দ্বের এই পরিবর্তনের জন্য, দীর্ঘস্থায়ী রণকৌশলকেও আমাদের সেই মোতাবেক পরিবর্তিত করা উচিত।

বর্তমানের নেপালী সমাজ একটা উৎক্রান্তিমূলক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পরিপূর্ণ বৈপ্লবিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে এই সমাজ যায়নি। এক দশক ব্যাপী ঐতিহাসিক জনযুদ্ধ এবং তারই ওপর ভিত্তি করে অদৃষ্টপূর্ব এক গণআন্দোলন নেপালে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন আনলেও মৌলিক এবং সার্বিক কোনও পরিবর্তন আসেনি, এবং সেটা আসেনি এই সংগ্রামগুলির কিছু সীমাবদ্ধতার কারণেই। এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলির পিছনে আমাদের পার্টির নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা থাকলেও তা নেপালী সমাজের কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। আমাদের পার্টির একার জোরের ওপর দাঁড়িয়ে এটা সম্ভব ছিল না। আমাদের জোট গড়তে হয়েছিল এমন কিছু সংসদীয় দলের সঙ্গে, যারা এই মৌলিক পরিবর্তনের বিরোধী। সেই হিসাবে, বৈপ্লবিক রূপান্তর, মাঝপথে এসে আটকে রয়েছে।

**সুতরাং, অবিলম্বে আমাদের একটা নতুন দীর্ঘস্থায়ী রণকৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন।** ২০০৮-এর শেষে আয়োজিত জাতীয় কনভেনশনে, প্রায় সপ্তাহব্যাপী বিতর্ক ও আলোচনার পর, অবশেষে আমরা 'জনগণের যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক জাতীয় প্রজাতন্ত্র', সংক্ষেপে 'গণপ্রজাতন্ত্র' গঠনের কর্মসূচীকে দীর্ঘস্থায়ী রণকৌশল হিসাবে সর্বসম্মতভাবে স্থির করে উঠতে পেরেছি।"[১৯]

খারিপতি কনভেনশন-এর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কমঃ গাজুরেল-এর এই রচনাটি রাজনৈতিক ভাবে গভীর ইঙ্গিতবাহী। ইতিপূর্বেই বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি, ২০০১-এর দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে CPN(M), 'রাজতন্ত্রকে' উচ্ছেদ করে 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' গঠনের রণকৌশলগত স্লোগানকে সর্বসম্মত ভাবে চূড়ান্ত করলেও সেই 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে' CPN(M)-এর ভূমিকা কি হবে, অন্যান্য সংসদীয় দলগুলির সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপ কি হবে, সর্বোপরি বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সঙ্গে এই পদক্ষেপের আন্তঃসম্পর্ক-ই বা কি হবে, তা নিয়ে পার্টির সর্বস্তরে বোঝাপড়ার কোনও সমসত্ত্বতা ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা হল, 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'-এর এই রণকৌশলগত স্লোগানের সঙ্গে 'বহুদলীয় গণতন্ত্র'-এর তাত্ত্বিক সূত্রায়নের ঠিক কি সম্পর্ক, তা নিয়েও বিভ্রান্তির প্রচুর অবকাশ ছিল। ২০০১ সালে পার্টি সর্বসম্মত ভাবে 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' গঠনের রণকৌশল গ্রহণ করে, কমঃ গাজুরেল এর সঠিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী "যেটাই আবার পুরানো রাষ্ট্র ব্যবস্থার অংশ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সংসদীয় দলগুলির সঙ্গে (আমাদের) সাময়িক জোট গঠনের ভিত্তি নির্মাণ করেছিলো।" এখন প্রশ্ন হল, এই জোট কি সত্যিই কৌশলগত? তথা, সাময়িক? CPN(M)-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বের একাংশ এপ্রশ্নে তখন ঠিক কি ভেবেছিলেন? ২০০৩-এ এসে আমরা দেখলাম, সমাজতন্ত্রের মধ্যে থেকেই উদ্ভূত আমলাতন্ত্রকে মোকাবিলা করার জন্য পার্টি 'বহুদলীয় গণতন্ত্র'-র কথা বললো, কমিউনিস্ট পার্টি যেখানে অন্যান্য দলের সঙ্গে 'রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা' চালাবে। 'বিপ্লবের আগে, না পরে'— এই প্রশ্নটি সেখানে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন থেকে গেল, যদিও যুক্তিবিন্যাসটি থেকে এটিই মনে হওয়া স্বাভাবিক, বিপ্লব উত্তর একটি সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই তত্ত্বায়নটি করা হয়েছিল। আবার ২০০৬ সালে এসে, কমঃ বাবুরাম ভট্টরাই এবং কমঃ প্রচন্ড'র ব্যাখ্যায় 'বহুদলীয় গণতন্ত্রের' এই বিষয়টি প্রায় একটি সাধারণ কর্মসূচীর মত করেই হাজির হল, যার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ২০০১ এবং ২০০৩-এর তত্ত্বায়ন এবং ২০০৬ পরবর্তীতে সে সম্পর্কে কমঃ বাবুরাম ভট্টরাই বা কমঃ প্রচন্ড যে ব্যাখ্যায় উপনীত হলেন, সেটিকে যদি সাযুয্যপূর্ণ তথা সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তার থেকে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে, যে নেপালের বর্তমান প্রজাতন্ত্রকে আরও 'সংহত' করাটাই কমিউনিস্টদের মূল কাজ। সংবিধান সভার মধ্যে লড়াই চালানোটাই সংগ্রামের মূল রূপ। এবং কমঃ প্রচন্ড-এর বক্তব্যের ঝোঁক ঠিক সেই দিকেই, যা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। আবার খারিপাতি কনভেনশন-এর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কমঃ গাজুরেল-এর বক্তব্যে এর উল্টো ঝোঁকটিই পরিস্ফুট। তাঁর মতে, ২০০১ সালে প্রজাতন্ত্র গঠনের স্লোগানকে সামনে রেখে সংসদীয় দলগুলির সঙ্গে সাময়িক জোট গঠনের যে রণকৌশল পার্টি নিয়েছিল, সেই **রণকৌশলটি তার কাজ শেষ করে ফেলেছে**। অবিলম্বে এখন একটা **নতুন দীর্ঘস্থায়ী রণকৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন**। স্পষ্টতঃই কমঃ গাজুরেল-এর এই বক্তব্য বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে অনির্দিষ্ট কাল ধরে 'বহুদলীয় গণতন্ত্রের' মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার তত্ত্বকে নাকচ করছে। দাবি করছে একটি নতুন রণকৌশল, বিপ্লবের চূড়ান্ত সাফল্যকে অর্জন করার রণনীতি যাতে আরও শক্তিশালী হবে।

নেপালের বিপ্লবী আন্দোলনের বর্তমান বাস্তবতায় রণনীতি ও রণকৌশলের সঠিক আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণে খারিপাতি কনভেনশন অবশ্যই একটা মাইলস্টোন। অন্তত নেপালের মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী ঝোঁকগুলিকে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা ও একটা দূর পর্যন্ত তাকে মীমাংসা করার পরিপ্রেক্ষিতে তো বটেই। নতুন যে রণকৌশলগত লাইন কনভেনশন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল, আগামী দিনে তা কতটা কার্যকরী হবে, ভবিষ্যতই সে প্রশ্নের জবাব দেবে।

**তথ্যসূত্র:**

১। "*Hoist the Revolutionary Flag on Mount Everest in the 21st Century*"; The Worker, 10th. issue, Pg 27।

২। *সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস*; [কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত কমিশন দ্বারা সম্পাদিত], পৃ. ১৬১-১৬২।

৩। ঐ, পৃ. ১৯৩-১৯৪।

৪। *The Question of Building a New Type of State*; The Worker, 9th issue, Pg. 24।

৫। *নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে*; মাও সে তুং।

৬। ঐ।

৭। *The Next Step in Nepal: An Interview with Dr. Baburam Bhattarai*; by Stephen Mikesell and Mary Des Chene, 10-16 issue of the Economic and Political Weekly (2008)।

৮। ঐ।

৯। ঐ।

১০। Inverview with the *Nepali Times*, April 16, 2008।

১১। *মাওবাদ এবং সর্বহারা বিপ্লবের বিষয়ে— সিপিআই(মাওবাদী) ও সিপিএন (মাওবাদী)-র পর্যবেক্ষণ ও মতামত*; র‍্যাডিক্যাল প্রকাশন, পৃ. ১৫-১৬।

১২। ঐ, পৃ. ৬৮-৬৯।

১৩। *Epochal Ten Years of Application and Development of Revolutionary Ideas*; The Worker, 10th issue, pg. 60।

১৪। পূর্বে উল্লেখিত র‍্যাডিক্যাল প্রকাশন; পৃ. ৮৪।

১৫। www.hindu.com/thehindue/nic/maoist.htm

১৬। পূর্বে উল্লেখিত র‍্যাডিক্যাল প্রকাশন; পৃ. ৮৪।

১৭। ঐ, পৃ. ১০০-১০১।

১৮। *People's Republic will be Federal and Competitive*; Inverview of Com. Prachanda, The Red Star, Vol. 1, No. 17।

১৯। *The Role of Major Tactical Line in making a New Constitution*; C.P. Gajurel, The Red Star, Vol. 2, No. 2।

---

* *নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-র রাজনীতি: একটি ট্রটস্কিবাদী মূল্যায়ন*; কমিউনিস্ট লিগ (চতুর্থ আন্তর্জাতিক) কর্তৃক প্রকাশিত, ৭ জুন ২০০৮।

# মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের সমস্যা:
# আজকের তত্ত্বগত সংগ্রামের গুরুত্ব ও স্বরূপ

দীপক বক্সী

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলেস-এর সূত্রায়িত দর্শন ও মতাদর্শ আজ এক কঠিন সঙ্কটের পর্বের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে। মার্কসীয় তত্ত্ব ভ্লাদিমির লেনিনের হাত ধরে যে প্রয়োগের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট ও পরীক্ষিত হয়েছে, তা যেমন একভাবে মার্কসীয় তত্ত্বকে বিকশিত করেছে, পাশাপাশি অনেক নতুন ও মৌলিক প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশে এক গুণগত উল্লম্ফন প্রয়োজনীয় ও আবশ্যিক হয়ে উঠেছে।

বিশ্ববীক্ষা হিসেবে মার্কসবাদ মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিকের জন্মলাভ থেকে শুরু করে স্ট্যালিনের তত্ত্বাবধানে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অবসানের মাধ্যমে প্রকৃতই এক 'আন্তর্জাতিক পথ পরিক্রমা' সমাপ্ত করেছে। এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে মার্কসীয় তত্ত্ব আজ একটা 'স্বীকৃত' আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের তত্ত্বধানে বিকশিত হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, শ্রেণিসংগ্রামে 'আন্তর্জাতিক চরিত্র' নিয়ে কোন মার্কসীয় তত্ত্ব ক্রিয়াশীল থাকছে না। এমনকি দেশে দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কেন্দ্রগুলি অনুশীলিত তত্ত্বের পর্যালোচনায়, সমকালীন (গত ১০০ বছরের) বুর্জোয়া তাত্ত্বিক আক্রমণগুলির মোকাবিলায় একবারেই ম্লান, পঙ্গু ও রুগ্‌ণ অবস্থায় পড়ে আছে বলা যায়।

মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশ এক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে—এই অবস্থান ও উপলব্ধিতে যাঁরা পৌছান, তাদের মধ্যে অবশ্যই মার্কসীয় তত্ত্বের উদ্ভব ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির ও ধারাবাহিক বিকাশের প্রক্রিয়াটিকে অনুধাবন, অনুসরণ করার প্রচেষ্টা জন্ম নেবে। আমরা 'মার্কসিস্ট ইন্টেলেকশন' পত্রিকা এই মতের অনুগামী। সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা দেখে নেব মার্কসীয় তত্ত্বের মৌলিক সূত্রায়নগুলি কি ধরনের আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে।

## মার্কসীয় তত্ত্ব কি একটি নতুন দর্শন?

স্বাভাবিকভাবেই, মার্কসীয় তত্ত্ব ও দর্শনের আন্তঃসম্পর্ক হল এ তাবৎ কালের মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। ১৯২৩-এ লেখা কার্ল কর্স-এর '*মার্কসিজম অ্যান্ড ফিলোজফি*'-র কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে আমরা মূল আলোচনায় ঢুকে যেতে পারি—

> "এটা সত্যি যে মার্কস এবং এঙ্গেলস্ প্রায় গর্বের সাথে লক্ষ্য করতেন যে ঐতিহাসিকভাবে জার্মান শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে ক্ল্যাসিকাল জার্মান দর্শন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলো। কিন্তু এর মানে তারা কখনো মনে করেননি যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র 'দর্শন'। অন্যদিকে, তারা তাদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য হিসাবে দেখতেন যে তা শুধুমাত্র পূর্বের সমস্ত বুর্জোয়া ভাববাদী দর্শনের আকারে এবং অর্ন্তনিহিত অর্থকে অতিক্রম করবে না, একেবারে দর্শনের তত্ত্ব-কে অতিক্রম করবে ..."
>
> "মার্কস এবং এঙ্গেলস্ যে ভাবে দর্শনের প্রশ্নটি মোকাবিলা করেছিলেন তাকে সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা করা যায় এইভাবে যেভাবে এঙ্গেলস্ একদা বর্ণনা করেছিলেন 'হেগেলীয় দর্শনের প্রতি ফয়েরবাখ-এর দৃষ্টিভঙ্গী': ফয়েরবাখ কেবলমাত্র অনাড়ম্বরভাবে তাকে একপাশে 'ঠেলে দিয়েছিলেন'। বাস্তবিক, পরের যুগের অনেক মার্কসবাদী, বাহ্যিকভাবে শিক্ষকদের নির্দেশের প্রতি অত্যন্ত 'নিষ্ঠা' সহকারে আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে, শুধুমাত্র হেগেলীয় দর্শন নয়, সামগ্রিকভাবে দর্শন তত্ত্বের প্রতি একই আচরণ করেছিলেন...."

মার্কসীয় দর্শন যে কোন দর্শন নয় এটা প্রমাণ করার জন্য প্রথম যে প্রচেষ্টাটি নেওয়া হয় তা হল, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্-এর দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতকে দর্শনের প্রশ্নে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া। এঙ্গেলস্ রচিত 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' ও 'ডায়ালেকটিকস্ অফ নেচার' মার্কসের দর্শন-সংক্রান্ত ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত— এই হচ্ছে মূল প্রতিপাদ্য। মার্কস তাঁর 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'-কে শুধুমাত্র সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় মানুষের চেতনা ও সমাজ সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণেই ব্যবহার করেছেন; সেখানে এঙ্গেলস্ 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'-কে প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা করেছেন, তাতে তিনি Naturalist Materialist-এর মতো আচরণ করেছেন, আসলে তিনি Metaphysical Materialist-এ অধঃপতিত হয়েছেন—এই হচ্ছে মূল বক্তব্য।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইতালীয় দার্শনিকদ্বয় Giovanni Gentile এবং Rudolfo Mondolfo এবং পোলিশ দার্শনিক Stanislow Berozowski প্রথম মার্কস ও এঙ্গেলসের দার্শনিক অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে এর সূত্রপাত ঘটে প্রথম Erwin Ban-এর লেখায়। ১৯২০ সালে দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের কমিনটার্নের মুখপত্র 'Koummunismus'-এ তার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয় যে মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশে এঙ্গেলসের ভূমিকা ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক। Ban-এর বক্তব্য হল, কার্ল মার্কস হলেন চিরায়ত জার্মান দশর্নের উত্তরসূরী, আর এঙ্গেলস হলেন পজিটিভিস্ট এবং ন্যাচারালিস্ট ধারণার প্রবক্তা। তাঁর কাছে মার্কসীয় তত্ত্বের কাঠামোয় এঙ্গেলসের ধারণা এবং রচনাসমূহ একেবারেই খাপ খায় না এবং বিজাতীয়। এই ধারণা জোরালোভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে হাজির হয় জর্জ লুকাচ-এর হাত ধরে। ১৯২৩ সালে তাঁর প্রকাশিত 'ইতিহাস ও শ্রেণীচেতনা'-য় তিনি মার্কস ও এঙ্গেলসের দার্শনিক তারতম্য প্রতিষ্ঠার ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে এঙ্গেলসের 'ডায়ালেক্‌টিকস্ অফ নেচার'-কেই আক্রমণের কেন্দ্রে রাখা হয়। লুকাচ-এর রচনায় ('ইতিহাস এবং শ্রেণি চেতনা'-থেকে উদ্ধৃত):

> "আমায় একটু বস্তুসত্তা-র ওপর এঙ্গেলসের যে দৃষ্টিভঙ্গী, তার উপর বিশদ আলোচনা করার অনুমতি দেওয়া হোক। একদিক দিয়ে, সেগুলি আমাদের কাছে এখনি কোনো মনোযোগের বিষয় নয়; কিন্তু, অন্যদিকে এই অংশটির মর্মার্থ বোঝার ব্যাপারে বহু মার্কসবাদীর উপর এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গীর যে বিশাল প্রভাব রয়েছে, সেটাকে ঠিক করতে গেলে সহজেই ভুল বোঝাবুঝির জন্ম দিতে পারে। ..."
>
> "কিন্তু, এঙ্গেলসের সবচেয়ে গভীর ভ্রান্তি ছিল এই বিশ্বাসে যে শিল্প এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলির আচরণ গঠিত হবে দ্বান্দ্বিক ও দার্শনিক

অর্থে অনুশীলনের দ্বারা। সহজ কথায়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হল গভীর এবং বিশুদ্ধ ধ্যানের সমার্থক। পরীক্ষাগুলি একটি কৃত্রিম, বিমূর্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে বিনা প্রতিবন্ধকতায়, বিনা বিশৃঙ্খলায় প্রকৃতির নিয়মের কাজকর্ম নিরীক্ষণ করা যায়, যেখানে 'সাবজেক্ট' এবং 'অবজেক্ট' দুজনেরই অযৌক্তিক উপাদানগুলিকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয়। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে তার পর্যবেক্ষণের বস্তুগত ভিত্তিকে বিশুদ্ধ, যুক্তিসম্মত বিষয়ে পরিণত করতে, গণিতের 'বোধগম্য বিষয়'-এ পরিণত করতে।

Karl Korsch (১৯২৩), তাঁর 'Marxism and Philosophy' রচনায় মন্তব্য করেছেন—

> "এই ব্যাপারটি সবচেয়ে ভালো দেখা যায় একটি উদ্ধৃতিতে যেখানে এঙ্গেলস ড্যুরিংকে আক্রমণ করেন; এখান থেকে আরও বেশি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, কারণ এই ধারণাটি বহু জায়গায় পোষণ করা হয় যে শেষের দিকে এঙ্গেলস অধঃপতিত হয়েছিলেন বিশ্বের প্রতি একটি পুরোপুরি প্রকৃতিবাদী-জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে— মার্কসের বিপরীতে, যিনি ছিলেন তার থেকে দর্শনগতভাবে বেশি শিক্ষিত ..."

১৯২০-এর দশকে এঙ্গেলসের রচনাসমূহ ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে এই প্রতিক্রিয়ার উৎস ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শোধনবাদীদের রাজনীতির স্বপক্ষে এঙ্গেলসের ভাবনার অপব্যাখ্যা। কাউটস্কি, হিলকার ডিং-এর বক্তব্য এইভাবে উপস্থিত হল যে—এঙ্গেলস দেখিয়েছেন প্রকৃতি নিজেই কিভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রক্রিয়াতে এগোয়। তাই সমাজ-বিকাশের ইতিহাসে পুঁজিবাদী সভ্যতা নিজের নিয়মেই ভেঙ্গে পড়বে। পুঁজিবাদী সভ্যতার ধ্বংস ও শ্রমিকশ্রেণির জয়লাভ-এ তাই মানব-চেতনার কোনো নির্ধারক ভূমিকা থাকার দরকার নেই। কাউট্স্কি লেখেন—

> "পুঁজিবাদী সমাজ আজকে অসফল: তার পতন সময়ের অপেক্ষা মাত্র; দুর্নিবার অর্থনৈতিক অগ্রগতি তার প্রকৃতিগত প্রয়োজনে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমান সমাজের জায়গায় একটি নতুন সমাজের গঠন আজ শুধুমাত্র কাঙ্ক্ষিত নয়, তা একপ্রকার অনিবার্য।"

এটা সত্যি যে পুঁজিবাদী সমাজের পতনের সাথে সাথে একটি নতুন সমাজের আবির্ভাব শুধুমাত্র কাঙ্ক্ষিত নয়, তা একপ্রকার অনিবার্যও বটে। কিন্তু, একই সঙ্গে, নতুন সমাজ-এর আবির্ভাব-এর পূর্বে, এটাও অনিবার্য যে শ্রেণিবদ্ধ সমাজে একটি কম্যুনিস্ট পার্টি-র আবির্ভাব ঘটবে, সেই পার্টির আদর্শগত নেতৃত্বে একটি শ্রেণিচেতনা সম্পন্ন শ্রমিকশ্রেণির বিকাশ ঘটবে এবং শ্রমিকশ্রেণির দ্বারা নতুন সমাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার রাস্তা উন্মোচন হবে। নিজের লেখনীর মাধ্যমে কাউট্স্কি কম্যুনিস্ট পার্টি, শ্রমিকশ্রেণি এবং চেতনার ভূমিকাকে কার্যত ইচ্ছাকৃতভাবেই খারিজ করে দিয়েছিলেন। সেই ক্ষেত্রে, নতুন সমাজ-এর দিকে অগ্রসরের যাত্রায় কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা শুধুমাত্র দূর থেকে বসে থাকা দর্শক ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব, কাউট্স্কি-র এই ভ্রান্ত দর্শন-উপলব্ধি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদী রাজনীতির জন্ম দিয়েছিল।

হিলফারডিং লিখেছেন—

> "যুক্তিগতভাবে, একটি বৈজ্ঞানিক প্রণালী বা রীতি হিসেবে মার্কসবাদ হলো শুধুমাত্র একটি সমাজের গতির নিয়মাবলীর একটি তত্ত্ব। মার্কসবাদের অকাট্যতাকে চিহ্নিতকরণ করা কোনো মতেই মূল্য-বিচারের কাজ নয়। বাস্তব আচরণবিধির দিশা তো মোটেই নয়। প্রয়োজনকে চিহ্নিত করা একটি ব্যাপার, কিন্তু সেই প্রয়োজনের জন্যে নিজেকে নিয়োগ করা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার।"

হিলফারডিং একটি নতুন সমাজের 'প্রয়োজনীয়তা'কে স্বীকার করতে তৈরী রয়েছেন, কিন্তু সেই প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে নিজেকে প্রয়োগ করার জায়গায় নেই। তাঁর দর্শনগত এবং রাজনৈতিক অবস্থান খুব স্পষ্ট। এঙ্গেলস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তাঁর দর্শন-উপলব্ধি কাউট্স্কি এবং হিলফারডিং-এর সংশোধনবাদী রাজনৈতিক তত্ত্বের জন্ম দেয়।

১৯৩০-এ Sidney Hook আবার এঙ্গেলসের 'ডায়ালেকটিকস অফ্ নেচার'-কে আক্রমণ করে লিখলেন যে এঙ্গেলস মার্কস-এর 'বৈপ্লবিক তত্ত্বকে' Positivist মতাদর্শে রূপান্তরিত করেছেন এবং মার্কস-এর 'Critical Historicism'-কে স্থূল বস্তুবাদে অধঃপতিত করেছেন। ১৯৫০-এর দশকে ফ্রান্সের বামপন্থী দার্শনিক Jean Paul Sartre– Maurcos Merlean এবং Henri Lefebore এবং ১৯৬০-এর দশকে Althusser-এরও সমালোচনার কেন্দ্রে এঙ্গেলস।

George Lichtheim তাঁর 'Marxism: A Historical and Critical Study' গ্রন্থে লিখলেন মার্কসের 'Critical Vision of a Critical Theory'-এর বিপরীতে এঙ্গেলস রচনা করেছেন, "dull science of causal evolution"-এর তত্ত্ব, মার্কসের "drastic transvaluation of values"-এর অনবদ্য ঐতিহাসিক সৃষ্টিকে এঙ্গেলস রূপান্তরিত করেছেন এক "cast iron system of laws"-এ। মার্কস, তাঁর মতে, যেখানে সচেতনভাবে প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চা এড়িয়ে যাচ্ছেন, এঙ্গেলস সেখানে ক্রমাগত যাত্রা করেছেন positivism এবং scientism-এর দিকে।

Z. A. Jordan-এর "The Evolution of Dialectical Materialism" গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করলেন যে Marx-এর প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চা হল 'naturalistic activism' বা 'anthropological realism', যাকে তিনি কখনই dialectical materialism-এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেননি। বিপরীতে এঙ্গেলস প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে dialectical materialism-এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন যা বাস্তবতঃ এঙ্গেলস-এর দার্শনিক ভাবনা-কে এক 'metaphysical materialism'-এ অধঃপতিত করেছে।

তাঁর *The Evolution of Dialectical Materialism* গ্রন্থে Z.A. Jordan একটি চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি আলোচনা করেছেন কিভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের জন্ম-বৃত্তান্ত ও পারিবারিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে নিয়ে গেছে। মার্কস জন্মেছিলেন এক সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পরিবারে, তাঁর আগ্রহের প্রধান বিষয়ই ছিল দর্শন, তাই তাঁর চিন্তা চিরায়ত বস্তুবাদ এবং ভাববাদ থেকে যথাযথ জ্ঞানতাত্ত্বিক সারবস্তুটুকু গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে, Avineri-এর মতে, এঙ্গেলস এক ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করায়, তার ব্যবসায়িক দৈনন্দিনতা তাকে এক 'স্থূল বস্তুবাদী'-তে পরিণত করে, মার্কস-এর মৃত্যুর পর যা পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে তার 'Dialectics of Nature' গ্রন্থে। দর্শন বিষয়ক চর্চায় এঙ্গেলস-এর দক্ষতা না থাকায় Hegel-এর terminology-গুলি তাঁর রচনায় নিছকই কতগুলি 'বাহ্যিক' এবং অগভীর শব্দে পরিণত হয়েছে। এঙ্গেলস তাঁর প্রকৃতিবিজ্ঞান methodology-তে মানব সমাজকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন। Avinery-এর মতে, চেতনার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সেক্ষেত্রে আর থাকে না, তার অর্থ হল এঙ্গেলস আদতেই সমাজ-ইতিহাসের বিবর্তনে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ছিলেন না।

কমবেশী একই ধরনের সমালোচনা করা হয়েছে Leszek Kolakowski-এর 'Main currents of Marxism'-এ; Jeff Coulter

'Marxism and Engels' Paradox'-এর 'The Concept of Nature in Marx'-এ যা প্রকাশিত হয়।

শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে লেখক লিখেছেন যে, মার্কসের প্রকৃতি-সংক্রান্ত স্পষ্ট ধারণা ছিল এবং 'sociohistoric character'-এর সামাজিক শ্রমের রূপ বিষয়ক আলোচনাতেই প্রকৃতির প্রসঙ্গ এসেছে। শুধুমাত্র মানুষের সমাজ সভ্যতার বিকাশের আন্তঃসম্পর্ক দেখাতেই মার্কস প্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। Schmidt লিখছেন, প্রকৃতি হচ্ছে 'প্রাক্-দ্বান্দ্বিক' এবং শুধুমাত্র মানুষকে সচেতন সক্রিয় বিষয়ে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রেই প্রকৃতি দ্বান্দ্বিক ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর মতে, প্রকৃতিকে জানার প্রক্রিয়াটাই শুধু দ্বান্দ্বিক, প্রকৃতি নিজে দ্বান্দ্বিকতার নিয়মে চলে না, প্রকৃতিতে নেতিবাচকতা নেই। যেহেতু শুধু মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক-ই দ্বান্দ্বিক হতে পারে, তাই বস্তুবাদিতার অদ্বান্দ্বিক হওয়াটাই প্রয়োজনীয়। মার্কসীয় তত্ত্ব আসলে, Schmidt-এর মতে, অ-সত্তাতত্ত্বীয় বস্তুবাদ। তাঁর মতে মার্কসবাদকে naturalised Hegelianism হিসাবে দেখা ঠিক নয়, যেখানে তার সত্তাতত্ত্বীয় ভিত্তিটাই শুধু বদলে দেওয়া যায়—spirit এর বদলে matter।

বিপরীত দিক থেকে, Lucio Coletti, তাঁর 'Marxism and Hegal' গ্রন্থে এঙ্গেলস-কে এই বলে সমালোচনা করেছেন যে তিনি বিরাজমান speculative bonds থেকে বিজ্ঞানকে মুক্ত করার বদলে, নিজেই তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন, এর কারণ হিসেবে তিনি লিখেছেন যে, এঙ্গেলস Hegel-এর 'philosophy of nature'-এর ধারণাকে natural science-এর ওপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দিয়েছেন।

সমালোচনার এই দীর্ঘ তালিকা শেষ করবো Althusser-এর একটা ছোট মন্তব্য দিয়ে—

> "দর্শনের ক্ষেত্রে মার্কসের অবদানের নতুনত্ব হল দর্শনের একটি নতুন অনুশীলন ও প্রচলন। মার্কসবাদ কোনো (নতুন) অনুশীলন-এর দর্শন নয়, কিন্তু তা দর্শনের একটি (নতুন) অনুশীলন।" (*লেনিন ও দর্শন*)

## মার্কসীয় তত্ত্ব ও মার্কসীয় দর্শন

'মার্কসবাদীদের' মধ্যেই অনেকে মনে করেন মার্কসীয় তত্ত্ব এক নতুন দর্শনের ভিত্তির ওপর তৈরী হয়েছে কিনা এই বিতর্ক অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন। প্রকৃতি-বিজ্ঞানে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কার্যকরী হোক না হোক প্রলেতারিয় একনায়কত্ব গড়ার প্রশ্নে যদি বিতর্ক না থাকে তাহলে অযথা সে প্রশ্নে বিতর্ক বাড়িয়ে তোলার বা নিষ্পত্তি করবার প্রয়োজনীয়তা কোথায় বা বিশেষত্ব কোথায়?

মার্কস-এঙ্গেলস-এর মৃত্যুর পর একদিকে কাউটস্কি-হিলফারডিং, অন্যদিকে Karl Korsch, Lukacs, Gramsci, Althusser সকলেই কার্ল মার্কসের প্রলেতারিয় একনায়কত্ব-এর ধারণা তাদের সমলোচনার প্রথম পর্বে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছেন, কার্ল মার্কসের মহান সৃষ্টি CAPITAL কে সামাজিক-ঐতিহাসিক বিবর্তনকে দেখার দিশা হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো প্রশ্ন বা দ্বিধা প্রদর্শন করেননি। তবু এই দুই ধারার পরিণতি সকলেরই জানা। এই দুই ধারা-কে বাদ দিয়ে মার্কসীয় তত্ত্বের বৈপ্লবিক প্রয়োগের ধারা হিসেবে লেনিন-স্ট্যালিন-মাও-সে-তুং-কে গ্রহণ করলে দেখা যাবে, যে এই আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিতর্ক এই মহান কমিউনিষ্টদের চিন্তা-প্রক্রিয়াকেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের বিরুদ্ধে লেনিন প্রবলভাবে তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু লুকাচ, কার্ল কর্স-এর বিরুদ্ধে স্ট্যালিন বা মাও সে তুং-এর কোনো রচনা পাওয়া যায় নি। মার্কসীয় দর্শন-কে পূর্ণতা দেওয়ার যে দায়িত্ব মার্কস-এর সাথে পরামর্শ ক্রমে এঙ্গেলস গ্রহণ করেছিলেন, লেনিনের কিছু আংশিক প্রচেষ্টার পর আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে তার কোনো ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় নি। মার্কসীয় দর্শনের ওপর কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেই মুহুর্মুহু আক্রমণ হয়েছে, নানা রঙের বিচিত্র অপব্যাখ্যা হয়েছে মার্কসীয় তত্ত্বের,—Materialism and Emperio-criticism-এর কোনো উত্তরাধিকারও রাখা হয়নি। প্রকৃতি-বিজ্ঞান নিয়ে এঙ্গেলসের চর্চা থেকে মার্কসবাদীরা যেন পিছু হটে গেছেন।

এই বিতর্ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, সামাজিক-ঐতিহাসিক বিবর্তনে চেতনার ভূমিকা কি হবে তা এই বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে চলে এসেছে। এঙ্গেলসের দর্শন চিন্তার অর্থ যদি এই দাঁড়ায় যে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মত সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনও নিজের নিয়মেই পুঁজিবাদ-কে ধ্বংস করবে, শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব-কে অনিবার্য করে তুলবে, তবে চেতনা বা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা অপ্রধান হয়ে যায়। শ্রমিকশ্রেণিকে class-in-itself থেকে class-for-itself স্তরে সংগঠিত করতে 'বাইরে' থেকে 'অগ্রণী চেতনা' নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। হেগেলের ধারণা অনুযায়ী 'চেতনার' ভূমিকা কখনও-ই বিরাজমান সমাজ-সভ্যতার বাইরে সমাজকে নিয়ে যেতে পারে না। কার্ল মার্কস-এর বক্তব্য অনুযায়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশ ও শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব সৃষ্টিতে চেতনার সাথে সমাজের দ্বান্দ্বিক ঐক্যতে চেতনার দ্বান্দ্বিক হস্তক্ষেপই এই গুণগত পরিবর্তন করার নির্ধারক শক্তি। সামাজিক-ঐতিহাসিক বিবর্তনে অনিবার্যতা এবং স্বাধীনতার আন্তঃসম্পর্ক সঠিক দ্বান্দ্বিক-সম্পর্কে কিভাবে পরিবর্তিত হবে, এটা অর্থনীতির প্রশ্ন নয়, সঠিক অর্থে রাজনীতি বা ইতিহাসের প্রশ্নও নয়—দর্শনের প্রশ্ন। 'মার্কসীয় দর্শন' বলে যদি কোনো দর্শনের অস্তিত্বই না থাকে, তবে অনিবার্যতা এবং স্বাধীনতা যে কোনো একটি বিবেচনায় থাকবে, অথবা দুটোই থাকবে, কিন্তু থাকবে পরস্পরকে অপসরণকারী উপাদান হিসাবে। সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় 'চেতনার' সঠিক ভূমিকা নির্ধারণ তাই একটি দার্শনিক প্রশ্ন, ভাববাদী এবং আধিবিদ্যক বস্তুবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম-ই শুধু নতুন নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টিকে এই অবস্থান গ্রহণে সক্ষম হতে সহায়তা করতে পারে। এ প্রশ্নে অসচেতনতা সঠিক অবস্থান গ্রহণ অসম্ভব করে তোলে। শুধু এই নয়, নিশ্চিতভাবে-ই ভ্রান্ত অবস্থান গ্রহণ আবশ্যিক করে তোলে, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-সে-তুং এবং তৎপরবর্তী কমিউনিষ্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক, মতাদর্শগত, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনায় তাই দার্শনিক প্রশ্নই প্রধান তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। পার্টি ও শ্রেণির চেতনাগত ফারাক শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব স্থাপনে, রাষ্ট্রের শুকিয়ে মরার প্রক্রিয়ায় কিভাবে পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হবে, সেখানে subject (এখানে পার্টি) ও object (এখানে গোটা শ্রমিকশ্রেণি)-এর অন্ত সম্পর্কে, object (শ্রেণি)-নিজে থেকে কেন কিভাবে কতটা পরিবর্তিত হয়, এবং সেই পরিবর্তন সাপেক্ষে subject (পার্টি)-এর ভূমিকা কিভাবে পরিবর্তিত হবে, তা যথাযথভাবে নির্ধারণ করাটাই কমিউনিষ্ট পার্টির আন্তর্জাতিকভাবে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্ব বা মুহূর্তে ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে তাই আমরা আবার ফিরে আসব।

## মার্কস-এঙ্গেলস ও মার্কসীয় তত্ত্ব

উপরে বর্ণিত বিতর্কগুলোকে মাথায় রেখেই মার্কস-এঙ্গেলস-এর ব্যক্তিজীবনে দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ বোঝার জন্যই আমরা তাদের

প্রথম জীবনের তত্ব চর্চা থেকেই আলোচনা শুরু করব। এই চর্চাগুলো বহুল প্রচারিত নয়, সবটা কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক বিতর্কগুলির সাথে সরাসরি সম্পর্কিতও নয়। তাই এই চর্চা কিছুটা ক্লান্তিকর হবে। কিন্তু উপরে বর্ণিত বিতর্কের প্রশ্নে একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণের জন্য তা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাদের প্রথম জীবনে, যখন দুজনের পরিচয় হয়নি, দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। কার্ল মার্কস তাঁর Doctoral Dissertation-এর জন্য তৈরী করেছিলেন—"The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature"। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা করেছিলেন 'Schelling on Hegel'। ঘটনাক্রমে দু'টোই একই বছরে, ১৮৪১ সালে, প্রকাশিত হয়। দুজনেরই বয়স ২১-২২ বছর। দু-টি রচনারই বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ দর্শন। বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ বর্তমান প্রবন্ধে নেই। তবু তাদের চিন্তার প্রাথমিক গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্যে সংক্ষিপ্ত অলোচনা করা যেতে পারে।

মার্কসের 'The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature'-এর—

Chapter One:

লেখাটির প্রধান অংশগুলির নামকরণ হল, 1. Opinions on the Relationship between Democritean and Epicurean physics. 2. Difficulties concerning the Identity of the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature. 3. The Declination of the Atom from the Straight Line.

Chapter Two:

The Qualities of the Atom. প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হয়েছে Democritean এবং Epicurean physics এবং তার পিছনে ক্রিয়াশীল দর্শন-প্রসঙ্গে। মার্কস আলোচনা শুরু করেছেন এইভাবে—

> গ্রীক দর্শনের এমন একটা পরিণতি হয়েছে, যা একটি ভাল বিয়োগান্তক কাহিনীতে সচরাচর হয় না; তা হল, একটি নিষ্প্রভ সমাপ্তি। গ্রীক দর্শনের বস্তুগত ইতিহাস থেমে যায় অ্যারিস্টটল-এর সাথে, যাকে গ্রীক দর্শনের ম্যাসিডন-বাসী আলেকজাণ্ডারের সাথে তুলনা করা যায়। এমনকি বীর 'স্টোইক্রা' (গ্রীক দার্শনিক জেনো-র মতাবলম্বী) অসমর্থ হয়েছিলেন 'অ্যাথেনা'-কে 'হেরাক্লিস'-এর সাথে বেঁধে রাখতে, যাতে সে পালাতে না পারে, যা সফলভাবে 'স্পার্টান'-রা তাদের মন্দিরে করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

Epicurean philosophy-কে মার্কস চিত্রিত করেছেন Democritean Physics-এর সঙ্গে Cyrenaic morality-র এক 'সমন্বয়কারী উপাদান' হিসেবে। Stoicism হল প্রকৃতি সম্পর্কে হেরাক্লিটিয়াক ভাবনা, জগৎ সম্পর্কে বৈরাগ্যময় নীতিশাস্ত্র সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী এবং অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিশাস্ত্রের এক যৌগ এবং Scepticism হল এইসব গোঁড়ামিবাদের সাথে সংঘর্ষকারী 'প্রয়োজনীয় অস্ত্র'। প্রাচীন গ্রীক দর্শনের দুইটি ভিন্ন বিবিধগ্রাহিতায় পরিণতির উৎস সন্ধানেই মার্কসের এই প্রবন্ধ রচনা। দু'টি চিন্তাধারার একটি হল Epicurean Stoic এবং Sceptic philosophy, অপরটি হল 'Alexandrian Speculation.' তাঁর উৎসাহের অতিরিক্ত কারণ হিসেবে মার্কস লিখেছেন, "... আরও বলতে গেলে, এটা কি উল্লেখযোগ্য নয় যে ব্যাপক বিস্তৃতি সম্পন্ন প্লেটোনীয় এবং অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের পরে এমন সব চিন্তাধারা আবির্ভূত হচ্ছে যেগুলি এই সব বৌদ্ধিক কাঠামোর উপর ভর না করে আরও পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করেছে এবং পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে আশ্রয় নিচ্ছে প্রাকৃতিক দর্শনের সরলতম ঘরানার উপর, আর নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সক্রেটীয় সম্প্রদায়ের উপর...।"

'The Qualities of Atom' শীর্ষক অংশে মার্কস atom-এর গঠন নিয়ে Democritean এবং Epicurean Physics বিষয়ে আলোচনা করেছেন: "গুণ সমূহের মাধ্যমে পরমাণু এমন একটি অস্তিত্ব অর্জন করে যা এটি সম্বন্ধে ধারণাকেই বিরোধ করে, এটিকে গণ্য করা হয় একটি অন্তরীভূত সত্তা হিসেবে যা তার সারের থেকে ভিন্ন। এই দ্বন্দ্বটিই Epicurus-কে এর প্রতি আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে Democritus কখনই পরমাণুর সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে তার গুণগুলিকে বিবেচনায় আনেন না। ধারণা ও অস্তিত্বের মধ্যে অন্তর্লীন বিরোধ রয়েছে তাকে তিনি কখনই বস্তুরূপ দেবার চেষ্টা করেননি।"

'De placitis philosophorum' গ্রন্থে মার্কস পেয়েছেন যে—Democritus-এর মতে atom-এর দুটি বৈশিষ্ট্য: আকার ও গঠন। Epicurus সেখানে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য যোগ করেন: ওজন। যদিও Aristotle-এর রচনা থেকে Democritus-এর মতামত সম্পর্কে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। তিনি বলেন—

> "অতএব, কোনো বস্তু পুরোপুরি হাল্কা হতে পারে না, যদি সকল বস্তুর ওজন বা ভর থাকে, কিন্তু যদি সকলেই হাল্কা হয়, তাহলে কেউ পুরোপুরি ভারী হবে না..."

মার্কস লিখেছেন যে তাঁর পড়া, 'Eighth book of Metaphysics'-এ তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, Democritus-এর মতে সকল পরমাণু অভ্যন্তরস্থ বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে একই, কিন্তু তারা পৃথক হয়ে যায় গঠন, অবস্থান ও বিন্যাসে। এই বইতে Democritean পরমাণুর বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'ওজন'-এর উল্লেখ করা হয়নি। এই বইতে Aristotle-এর উদ্ধৃতি থেকেও মার্কস পেয়েছেন Levcippus এবং Democritus-এর মতে পরমাণুর স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে তার গঠন, বিন্যাস এবং অবস্থানে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মার্কসের মতে—

> "ডেমোক্রিটাস বাহ্য অবস্থা বা রূপের বিভিন্নতার ভিত্তিতে পরমাণুর ধর্ম নির্ধারণ করেছিলেন; পরমাণুর নিজস্ব ভিত্তিতে নয়..."
>
> "শুধুমাত্র রূপের বিভিন্নতা ডেমোক্রিটাস-কে উৎসাহিত করেছিল কারণ গঠন, আকার, অবস্থান এবং বিন্যাসের মধ্যে তার চাইতে অধিক কিছু নেই"।

অন্যদিকে, Epicurus-এর কাছে আকার, গঠন এবং ওজন হচ্ছে পরমাণুর তিনটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য।

এরপর মার্কস পরমাণুর গুণগুলির নির্ধারণ বিষয়ে Epicurus-এর মতামত প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রথমতঃ Epicurus পরমাণুর বৈশিষ্ট্য হিসেবে আকার-এর কথা বলেছেন, তারপর তা আবার নাকচ করে দিয়েছেন। তাদের নিজস্ব আকার নয়, পরমাণুগুলির মধ্যে আকরের কিছু তারতম্যকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। মার্কস এরপর লিখলেন—

> "এখন আমি আর এই বিষয়ে চিন্তা করব না যে ইউসেবিয়াস-এর মতে, এপিকুরাস হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি পরমাণুকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র

বলে চিহ্নিত করেছিলেন। অন্যদিকে ডেমোক্রিটাস পরমাণুকে সবচেয়ে বৃহৎ আখ্যা দিয়েছিলেন (স্টোবিয়াস-এর মতে পৃথিবীর মতো বড়)। এটি একদিকে অ্যারিস্টটল-এর প্রামাণিক সাক্ষ্যকে অস্বীকার করছে, অন্যদিকে ইউসেবিয়াস অথবা আলেকজান্দ্রার পাদ্রী ডায়নিসিয়াস, (যেখান থেকে তিনি উদ্ধৃতি করেন) নিজেকে অস্বীকার করছেন; কারণ একই বই থেকে আমরা জানতে পারি যে ডেমোক্রিটাস প্রকৃতির নিয়ম হিসেবে যুক্তির মাধ্যমে ধারণা করেছিলেন অবিভাজ্য কণার উপস্থিতি। এই ব্যাপারটি অন্তত পরিষ্কার যে ডেমোক্রিটাস নিজে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না; তিনি সেই দিকে নজর দেননি, অন্যদিকে, এটি-ই ছিল এপিক্যুরাস-এর মূল আগ্রহ..."

Epicurean পরমাণুর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল গঠন। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটিও পরমাণুর ধারণাকে বিরোধ করে। এবং এর বিপরীতটাকেই মান্যতা দিতে হবে—

"বিমূর্ত স্বাতন্ত্র্য হল বিমূর্ত নিজস্ব একরূপতা; সেই জন্য তার কোনো গঠন বা আকার নেই।"

মার্কস লিখেছেন, Epicurus-এর তত্ত্ব। তাই, atom-গুলির মধ্যকার গঠনের বিভিন্নতা 'নির্ধারণ করা যায় না', যদিও তারা 'চূড়ান্তভাবে অসীম'ও নয়। বরং, এই তফাৎ 'নির্দিষ্ট এবং সসীম সংখ্যা'র। Epicurus-এর মতে তাই এটা নিশ্চিত যে, যত ধরনের পরমাণু আছে, পরমাণুর ততগুলি পৃথক আকৃতি নেই—

"স্বাভাবিকভাবেই, এটি আবার আকৃতি নির্ধারণের কথা বলল, কারণ একটি আকার যখন, অন্য আকারের সাথে পৃথক থাকে না, তাকে কখনো আকার বলা চলে না।"

Democritus পরমাণুর অসীম সংখ্যার আকৃতি আছে বলে মনে করেন।

Epicurus যে ওজনকে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করছেন, এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ 'ভরকেন্দ্র'-তেই বস্তু আদর্শ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে, যা পরমাণুর এক প্রধান নির্ধারক। কিন্তু ওজন পরমাণুর ধারণাকে সরাসরি অস্বীকার করে কারণ—

'সেটি হল বস্তুর স্বাতন্ত্র্য, যা বস্তুর বাইরে অবস্থিত একটি আদর্শ কেন্দ্র। কিন্তু, পরমাণু হল নিজেই এই স্বাতন্ত্র্য যেন সেটি হল একটি ভরকেন্দ্র যেটি নিজস্ব অস্তিত্ব হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করে।'

সুতরাং 'ওজন' হল 'বিভিন্ন ওজন' এবং পরমাণুগুলি নিজেরাই জ্যোতিষ্কগুলির মতো ভরকেন্দ্র। এবং যখন একটি পরমাণুকে অপর কোনো পরমাণুর সাথে তুলনা না করে 'শূন্যের পরিপ্রেক্ষিতে' বিবেচনা করা হয়, 'ওজন নির্ধারণ'-এর আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। তাই, পরমাণুগুলি ভর এবং গঠনে যতই আলাদা হোক না কেন, শূন্য সমান গতিতে এ move করে—

"সেইজন্য, এপিক্যুরাস ওজনকে প্রয়োগ করে বিকর্ষণ এবং তার ফলস্বরূপ গঠন-এর ক্ষেত্রে।"

মার্কস বলেন,

"গ্যাসেনন্তি এপিক্যুরাস-কে প্রশংসা করেন কারণ, শুধুমাত্র যুক্তিকে অবলম্বন করে তিনি পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করেন— এই পরীক্ষিত সত্য যে প্রত্যেক বস্তু, তাদের ভর ও ওজন বিভিন্ন হলেও, একই গতিতে উপর থেকে নীচে পড়ে।"

মার্কস এই অংশের উপসংহার টেনেছেন এইভাবে:

"পরমাণুর গুণসমূহের বিচার তাই অবনমনের (declination) বিচারের মতো একই ফলের দিকে আমাদের নিয়ে যায়, যেমন এপিকিউরাস পরমাণুর ধারণায় **সার ও অস্তিত্বের মধ্যেকার** দ্বন্দ্বকে বস্তুরূপ দেন। এই ভাবে তিনি আমাদের উপহার দেন পরমাণু সংক্রান্ত বিজ্ঞান। অপরপক্ষে, ডেমোক্রিটাসের মধ্যে নীতির কোন বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা নেই। তিনি কেবল বস্তুগত দিকটিকে বজায় রাখেন এবং প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য অনুমানগুলিকে উপস্থিত করেন।"

প্রবন্ধটির প্রথম অংশেই আলোচনা করা হয়েছে দু'টি দার্শনিক প্রবণতা বিষয়ে—

"ডেমোক্রিটাস এবং এপিক্যুরাস-এর প্রকৃতির দর্শনের অভিন্নতা নিয়ে সমস্যাবলী।"

মার্কস লিখেছেন, দর্শন সম্পর্কে বিভ্রান্ত ও বিরক্ত হওয়ায় Democritus তাড়িত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণ-এর মধ্যে—

"তিনি নিজেকে নিশ্চিত সদর্থক জ্ঞানের দিকে ছুঁড়ে দেন।"

Democritus পাণ্ডিত্য ছিল পদার্থবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, গণিত এবং জ্ঞানের আরও বহুবিধ শাখায়—

"এই সেই ব্যক্তি যিনি, সিসেরোর মতে, পৃথিবীর অর্ধেক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরেছেন। কিন্তু, তিনি যাকে খুঁজেছিলেন তাকে তিনি পাননি।"

Epicurus-এর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ঠিক এর বিপরীত—

"এপিক্যুরাস ছিলেন দর্শনে পরিতৃপ্ত এবং পরম সুখী। তিনি বলেন 'তুমি দর্শনকে সেবা এবং সাহায্য করবে যাতে তুমি সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করতে পার। যে ব্যক্তি নিজেকে দর্শনের অধীনে নিয়ে গেছেন এবং তার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাকে আর অপেক্ষা করতে হয়না। তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে যান। কারণ দর্শন-কে সেবা করা মুক্তির সমার্থক।"

মার্কস লিখেছেন—

"আমরা শেষ পর্যন্ত এই ভাবনাকে বিবেচনা করে দেখব যা চিন্তনের সাথে সত্তার সম্পর্ককে বর্ণনা করে। এক দার্শনিক পৃথিবী এবং চিন্তন-এর মধ্যে যে সাধারণ সম্পর্ক লক্ষ্য করেন, তিনি তাঁর নিজের বিশিষ্ট চেতনার সাথে বহির্বিশ্বের সম্পর্ককে প্রায় নিজের লক্ষ্যবস্তু করে তোলেন।"

"এদিকে ডেমোক্রিটাস প্রয়োজনীয়তাকে ব্যবহার করেন বাস্তবের প্রতিবিম্বের একটি রূপ হিসেবে। অ্যারিস্টটল তাঁর সম্পর্কে বলেন যে তিনি প্রত্যেক জিনিষকে পশ্চাদে অনুসরণ করে অনিবার্যতার দিকে নিয়ে যান।"

"আরও পরিতোষজনক ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'ডি প্ল্যাসিটিস্ ফিলোসোফোরাম'-এর লেখক। ডেমোক্রিটাসের মতে অনিবার্যতা হল বিধাতা এবং জগতের সৃষ্টিকর্তা।

Epicurus-এর সাথে তুলনা করুন—

"কিছু মানুষের বক্তব্য অনুযায়ী যে অনিবার্যতাকে চরম নিয়ন্তা হিসেবে দেখানো হয়, তার কোনো বাস্তব উপস্থিতি নেই। কিন্তু, কিছু ঘটনা ঘটে আকস্মিকভাবে, কিছু ঘটনা আমাদের বিধিবহির্ভূত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু, আপাতন বা আকস্মিকতাকে গ্রহণ করতে হবে, যা অধিকাংশ বিশ্বাস করে সেই ঈশ্বরকে নয়।"

মার্কস লিখেছেন—

"অতএব, এইটি ঐতিহাসিকভাবে সঠিক যে ডেমোক্রিটাস অনিবার্যতা-কে ব্যবহার করেছিলেন, এপিক্যুরাস আপাতন-কে ব্যবহার করেছিলেন, এবং একেকজন অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিতর্কমূলক উস্কানিমূলকভাবে খারিজ করেছিলেন। এই ভিন্নতার প্রধান পরিণতি আসে এক একটি প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যার ভিন্নতা হিসেবে।"

মার্কসের এই রচনা পদার্থবিদ্যা ও দর্শনের আন্তঃসম্পর্ক এবং গ্রীক দর্শনের বিবর্তনের স্বরূপ উদ্ঘাটন বিষয়ে। আগ্রহের বিষয় বিশেষতঃ এসময়ে যে ২২ বছর বয়সে মার্কস— (১) হেগেলের এবং ফয়েরবাখের চিন্তার দ্বারা কতটা প্রভাবিত ছিলেন, (২) প্রকৃতির সঙ্গে চেতনার সম্পর্ক তার কাছে কিভাবে উপস্থিত হচ্ছিল।

প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করব, ১৮৪১ সালে এই লেখা প্রকাশ করার সময় হেগেলের দর্শন সম্পর্কে কার্ল মার্কস-এর দৃষ্টিভঙ্গী কী ছিল।

এই লেখা প্রকাশিত হওয়ার (১৮৪১) ৪ বছর আগে ১৮৩৭-এ মার্কস তাঁর বাবাকে লেখা একটা চিঠিতে [Letter from Karl to his father in Trier (1837) লিখেছেন—

"এই ভাববাদ, যাকে আমি কান্ট্ এবং ফিখ্‌টের ভাববাদের সাথে তুলনা করেছি এবং তার দ্বারা স্পষ্ট করেছি, আমি আজকে বাস্তবের মধ্যেই এই ভাব খুঁজতে শুরু করেছি। আগে যদি দেবতাগণ পৃথিবীর উপরে অধিষ্ঠিত থাকতেন, এখন তারা পৃথিবীর কেন্দ্রে চলে এসেছেন"।

"আমি হেগেলের দর্শনের খণ্ডিত অংশ পড়েছি, যার দুরারোহ অদ্ভুত বর্ণনা আমায় আকর্ষণ করেনি। আরও একবার আমি সমুদ্রে ঝাঁপাতে চাই, কিন্তু এই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে যে আমি প্রমাণ করব মনের ধর্ম ও গুণ দেহ-র ধর্মের মতোই প্রয়োজনীয়, মূর্ত এবং বাস্তব ভিত্তি সম্পন্ন। আমার আর তরবারি খেলার দক্ষতা অনুশীলন করা উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য দিনের আলোয় সত্যিকারের মুক্তোর অনুপ্রবেশ।"

হেগেলের চিন্তার সাথে মার্কস-এর বিচ্ছেদ সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে উদ্ধৃতিটিতে। তিনি কি তাহলে ফয়েরবাখের আধিবিদ্যক বস্তুবাদের দ্বারা সে সময়ে পুরোপুরি প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন? তিনি কি তখনও হেগেলের 'দ্বান্দ্বিকতা'-র তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারেননি? একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১৮৪১-এ মার্কসীয় দর্শন, মার্কসীয় তত্ত্ব পূর্ণ বিকশিত হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই তার ভাবনার মধ্যে ফয়েরবাখের প্রভাব থেকে যাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব নেই। হেগেলের 'দ্বান্দ্বিকতা'-র নীতি গ্রহণ করেও তার ভাববাদী ভিত্তির বিরুদ্ধে মার্কস-কে লাগাতার সংগ্রাম করতে হয়েছে। দ্বন্দ্বতত্ত্বে-র 'স্রষ্টা' (যদিও তার আগেই অর্ধ-বিকশিত অবস্থায় 'দ্বান্দ্বিকতা'র তত্ত্ব দর্শনের জগতে উপস্থিত হয়েছিল)-এর হাত থেকে বস্তুবাদী দর্শনের কাঠামোর মধ্যে তাকে নিয়ে আসা সহজ হয়নি কখনই। কিন্তু ১৮৪১-এর আলোচ্য রচনাটি লেখবার সময় মার্কস ফয়েরবাখের চিন্তা থেকেও যে মুক্ত হচ্ছিলেন তার প্রমাণ উপরে উল্লেখিত চিঠিটি-তে পাওয়া যায়—

"আমি একটি ২৪ পৃষ্ঠাযুক্ত বক্তব্য লিখেছি: দর্শনের উৎপত্তির কেন্দ্র এবং তার প্রয়োজনীয় প্রসার। এখানে, কলা এবং বিজ্ঞান, যাদের একে অপরের সাথে পুরোপুরি বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তাদের কিছু দূর অবধি একত্রিত করা গিয়েছে। এবং একজন উৎসাহী যাত্রী হিসেবে আমি নিজেই এই কাজটি গ্রহণ করেছি। দেবত্ব-র একটি দার্শনিক-দ্বান্দ্বিক মূল্যায়ন, যা নিজেকে প্রকাশ করে ভাব হিসেবে, ধর্ম হিসেবে, প্রকৃতি হিসেবে, ইতিহাস হিসেবে।"

দেবত্বের দার্শনিক-দ্বান্দ্বিক পরিমাপ কোনো ফয়েরবাখীয় প্রচেষ্টা হতে পারে না। মূল রচনাটিকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাক।

প্রবন্ধটিতে মার্কস লিখেছেন—

"সত্তা এবং নির্যাস-এর যে দ্বন্দ্ব, বস্তু এবং আকারের যে দ্বন্দ্ব যা একটি পরমাণুর ধারণার মধ্যে সহজাত, তা একটি একক পরমাণুর মধ্যে বহিঃপ্রকাশ করে যখন সে কোন গুণাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।"

"অবাধ আকার এখন অধঃপতিত হয়েছে অবাধ বস্তুতে, অধঃপতিত হয়েছে দৃশ্যমান জগতের আকারবিহীন অধঃস্তরে।"

যেভাবে এখানে দ্বান্দ্বিকতার নিয়ম উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার বিপরীত। অর্থাৎ এপিকিউরীয় এবং ডেমোক্রেটীয় দর্শনের বস্তুবাদী ভিত্তিটাকে অটুট রেখে 'অনিবার্যতা' এবং 'আপতনের' উপর আধিবিদ্যক ঝোঁকটিকে নাকচ করা হয়েছে। তাদের দ্বান্দ্বিক ঐক্য স্থাপন করা হয়েছে। এই তত্ত্ব হেগেলীয় তো নয়ই, ফয়েরবাখীয়-ও নয়। এ হল ভ্রূণাবস্থিত মার্কসীয় দর্শন। 'অনপেক্ষ আকার'-এর অনপেক্ষ বস্তুতে অধঃপতিত হওয়া, সত্তা এবং নির্যাসের দ্বন্দ্ব, বস্তু এবং আকারের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, স্বতন্ত্র পরমাণুর মধ্যে উদ্ভূত হওয়াকে সূত্রায়িত করাকে অপর কোনো দর্শনের আধারে স্থান দেওয়া যায় না।

অন্যদিকে যে-টা স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে প্রকৃতি-র গঠন রহস্যের ক্ষুদ্রতম স্বাধীন অস্তিত্বের সন্ধানে এই দর্শন চর্চা, পরমাণুর সত্তা এবং নির্যাসের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যার মার্কসীয় দর্শনের এই উদ্ভব এটা স্পষ্ট করে তোলে, চেতনা, মানব মস্তিষ্কের বস্তুগত সক্রিয়তার ফল, এবং তার বস্তু জগতের নিয়মগুলিকেই (laws) চিন্তা আকারে পুনরুৎপাদন করে। মানব সভ্যতার সামাজিক ঐতিহাসিক বিবর্তন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী হয়েছে এ কারণেই যে প্রকৃতি নিজে ঐ নিয়ম অনুসরণ করে, প্রকৃতি-র অংশ হিসেবে মানুষ এবং সজীব মস্তিষ্কের ক্রিয়া একই নিয়ম অনুসরণ করে। প্রকৃতিকে, প্রকৃতি-বিজ্ঞান-কে, পদার্থ-বিদ্যাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের আলোয় বোঝার প্রথম চেষ্টা কার্ল মার্কস-ই করেছিলেন। তা ছিল প্রাথমিক প্রচেষ্টা, ভ্রূণাবস্থিত মার্কসীয় দর্শন।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের তত্ত্বাবধানে মার্কসীয় দর্শন ও মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশ-কে বোঝার জন্য এঙ্গেলসের চিন্তা-প্রক্রিয়ার বিবর্তনটিও আমাদের জেনে নিতে হবে।

১৮৩১ সালে হেগেলের মৃত্যু হয়। এর পরবর্তী ১০ বছর অর্থাৎ ১৮৪১ পর্যন্ত বলা যায় জার্মানিতে হেগেলীয় দর্শন এক বৈপ্লবিক দর্শনের মর্যাদাই পেয়ে এসেছে। ১৮৪১ সালে, এঙ্গেলসের ২১ বছর বয়সে, তিনি যখন 'Schelling on Hegel' নামক তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক

প্রবন্ধটি রচনা করেন, তখনও তিনি তাঁর তরুণ হেগেলপন্থী অস্তিত্ব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হননি। তবে ২১ বছর বয়সে রচিত তার এই প্রবন্ধ, এই স্বাক্ষর রেখে গেছে যে ছাত্রাবস্থা থেকেই দর্শন শাস্ত্রে তার পাণ্ডিত্য অত্যন্ত উন্নত মার্গের ছিল। তবে ১৮৩০-এর দশকের শেষ দিক থেকেই যে তথাকথিত 'তরুণ হেগেলপন্থী'রা তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভূত সংকটের কারণে 'হেগেলীয়' তত্ত্বের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছিলেন ১৮৮০-তে প্রকাশিত "Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy. Part I, Engels এর রচনায় তা পাওয়া যায়—

> "ত্রিশের দশকের শেষের দিকে, এই ধারার বিভাজিকা ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে উঠতে লাগল। বামপন্থী অংশটি তথাকথিত তরুণ হেগেলপন্থীরা গোঁড়া এবং সামন্ততান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর মাধ্যমে, তখনকার সময়ের জ্বলন্ত প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সেই দার্শনিক শোভনতা আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করল যখন, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, গোঁড়া মতবাদ এবং পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলহেল্‌ম-এর সাথে রাজসিংহাসনে উঠল। এখন খোলাখুলি পক্ষাবলম্বন আর এড়ানো গেল না। তখনো পর্যন্ত লড়াই জারি ছিল দার্শনিক অস্ত্রের মাধ্যমে, কিন্তু কোনো বিমূর্ত দার্শনিক উদ্দেশ্যের জন্য নয়।"
>
> "সেটা তখন প্রত্যক্ষভাবে ঐতিহ্যবাহী ধর্ম এবং তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। 'Deutsche Jahrbucher'-এ বাস্তব প্রয়োগ এবং উদ্দেশ্য তখনো পর্যন্ত প্রধানত দর্শনের ছদ্মবেশে পেশ করা হত। 'Rheinische Zeitung of 1842'-তে, 'ইয়াং হেগেলীয়ান স্কুল' নিজেকে সরাসরি উচ্চাকাঙ্ক্ষী র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া-দের দর্শন হিসেবে প্রকাশ করেছিল। তারা একটি পাতলা দর্শনের আবরণ ব্যবহার করতেন বিধিনিষেধ এড়ানোর জন্য।"

তরুণ হেগেলীয় দার্শনিকদের ঐ গোষ্ঠীর, কার্ল মার্কসও যার একজন সদস্য ছিলেন, প্রকৃত নেতা ছিলেন Bruno Bauer, বয়সে মার্কস-এঙ্গেলস-এর থেকে Bruno ও Strauss দুজনেই ৮-৯ বছর বড় ছিলেন। কিন্তু এসময়েই (১৮৩৮-১৮৪৩) মার্কস এবং এঙ্গেলসের সাথে এদের চিন্তার বিচ্ছেদ ঘটে। তরুণ হেগেলীয়দের মধ্যেকার মতপার্থক্য উঠে এসেছে এঙ্গেলসের কথায়—

> "তখনকার সময়ে রাজনীতি ছিল একটি অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ স্থান; সেইজন্য, প্রধান লড়াই ছিল ধর্মের বিরুদ্ধে: এই লড়াই, বিশেষত ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের পর, পরোক্ষভাবে রাজনৈতিকও ছিল। স্ট্রস লিখিত 'যীশুর জীবনী' যা ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, প্রথম আঘাতটি দেয়। এরপরে খ্রিস্টের উপদেশাবলী নির্মিত পুরাণগুলি দ্বারা যে তত্ত্ব গঠন করা হয়, পরে সেই তত্ত্বকে ব্রুনো বয়ার আক্রমণ করেন এই প্রমাণ সহ যে খ্রিস্টান ধর্মের বর্ণিত কাহিনীগুলি লেখকদের কল্পনার বর্ণনা মাত্র। এই দুই ধারার বিতর্ক চালানো হয়েছিল 'আত্মচেতনা' এবং 'বিষয়বস্তু'-র লড়াইয়ের দার্শনিক ছদ্মবেশে।"

ভাঙ্গনের একটা প্রক্রিয়া তরুণ হেগেলবাদীদের মধ্যে যখন চলছে, তখন হেগেলবাদী প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে তছনছ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮৪১-এর ডিসেম্বরে তৎকালীন সদ্য নিয়োজিত সংস্কৃতি মন্ত্রী প্রুশীয় যুবকদের মন থেকে হেগেলীয় সর্বেশ্বরবাদের সর্বনাশা বীজ উৎখাত করার জন্য Friedrick Schelling-কে বার্লিনে নিয়ে আসেন।

Friedrick Schelling একসময় হেগেলের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন (পরবর্তী জীবনে তিনি হেগেলের প্রবল বিরোধী হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন) এবং Fichte-এর চাকরি থেকে বিতাড়নের পর তিনি Jena-তে দর্শনের অধ্যাপক হয়েছিলেন। ১৮৪১-এ তিনি ছিলেন চিরায়ত জার্মান দর্শনের একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি। ১৮৪১-এ তিনি তাঁর পুরনো 'প্রকৃতির দর্শন' (Philosophy of Nature) ত্যাগ করে তাঁর নতুন দার্শনিক তত্ত্ব 'উন্মোচনের দর্শন' (Philosophy of Revelation)-এর তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। এঙ্গেলসের লেখা 'Schelling on Hegel' হল ১৮৪১-এ বার্লিনে দেওয়া Schelling-এর সেই 'বিখ্যাত' হেগেল-বিরোধী ভাষণের এক সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ।

প্রবন্ধটিতে Engels Schelling-এর তীব্র সমালোচনা করেছেন, এবং Hegel-এর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

Schelling-এর ভাষণটির যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি এঙ্গেলস প্রবন্ধে স্থান দিয়েছেন, তার মূল প্রতিপাদ্য হল এই যে— Schelling-এর মতে হেগেল 'নির্যাস' এবং 'সত্তা'-র মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন, আসলে প্রয়োজন ছিল, "সত্তার দর্শনে প্রত্যাবর্তন।" এছাড়া হেগেল যুক্তি (reason)-এর 'নেতিবাচক' দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে সওয়াল করেছেন, কিন্তু আসলে প্রয়োজন ছিল 'ইতিবাচক' উন্মোচনের দর্শনের।

এঙ্গেলস লিখেছেন—

> "আমরা 'ইতিবাচক দর্শন (positive philosophy) নিয়ে কথা শুনিনি। 'নেতিবাচক' দর্শনের (Negative philosophy) আবির্ভাব হয়েছিল চল্লিশ বছর পূর্বে একটি অসম্পূর্ণ আকারে, যাকে শেলিং নিজেই পরিত্যাগ করেছিলেন এবং এখন তাকে তিনি বিকশিত করছেন তার সত্যিকারের পূর্ণ রূপে। তার ভিত্তি হল যুক্তি, জ্ঞান এবং বোধের বিশুদ্ধ শক্তি, যার মধ্যে তাৎক্ষণিক উপাদান হিসেবে রয়েছে সত্তার বিশুদ্ধ শক্তি সত্তায় পরিণত হবার অসীম শক্তি। যে প্রয়োজনীয় তৃতীয় মৌল এখানে যুক্ত হবে তা হল সত্তার উপর ক্ষমতা, যে নিজেকে আর আলাদা করতে পারবে না: এই হল পরম এবং সর্বোপরি আত্মা, যেটা সত্তায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন থেকে মুক্তি পায় এবং সত্তার থেকে চিরন্তন মুক্তিতে রয়ে যায়। পরমকে বলা যেতে পারে এই সকল শক্তির 'অরফীয়' ঐক্য।

এঙ্গেলস এই তত্ত্বের নাম দিয়েছেন নয়া শিলিংবাদ (neo Scellingianism)।

এঙ্গেলস প্রশ্ন রেখেছেন, 'অভিন্নতার দর্শন' (philosophy of identity)-র নতুন সংস্করণের কি দাঁড়াল? Kant যুক্তিবাদী চিন্তাকে space এবং line থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন; Schelling সত্তাকে মুক্ত করে নিয়েছেন। আমাদের জন্য আর কি রইল। এঙ্গেলস লিখেছেন, "অস্তিত্ব হচ্ছে চিন্তার অধিকারভুক্ত সত্তা মনের মধ্যে অন্তরীভূত এবং আধুনিক দর্শনের ভিত্তি— The cogito ergo Sum— তাকে এক ঝটকায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর বিরুদ্ধে এটা প্রমাণ করার জায়গা এটি নয়। কিন্তু আমাকে কি এটি জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দেওয়া হবে যে শক্তি, যার কোন সত্তা নেই, সে একটি সত্তার জন্ম দিতে পারে কিনা, শক্তি যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে না, সে তবুও শক্তি কিনা, শক্তির ত্রিবিভাজন (trichotomy) হেগেলের 'বিশ্বকোষ'-উদ্ভূত ভাব, প্রকৃতি এবং মন, এই ত্রয়ীর সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?

Schelling-এর 'অস্তিত্ববাদ'-এর পরবর্তী ইতিহাস এ প্রসঙ্গে কিছুটা বলে আমরা এই আলোচনা শেষ করব। বার্লিনে Schelling-এর সেই 'বিখ্যাত' ভাষণে শ্রোতার আসনে ছিলেন Soren Kierkegaard। তিনি অস্তিত্ববাদের একজন বিখ্যাত প্রবক্তা। পরবর্তী পর্যায়ে Schelling-এর তুলনায় Kierkegaard 'অস্তিত্ববাদে'-র প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিশেষ ভূমিকা নেন। পরবর্তীতে এই তত্ত্বের প্রধান ধারা ছিলেন Friedrich

Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Heidegger এবং Jean-Paul Satre। Martin Heidegger ছিলেন হিটলারের একজন সক্রিয় সমর্থক ও রাজনীতিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ের পরেই শুধু তার কিছু সমালোচনা পাওয়া যায়। জাঁক দেরিদা জানিয়েছেন তিনি হাইডেগারের কাজের ধারাবাহিকতাই বহন করছেন, মিশেল ফুকোও একই ধরনের মন্তব্য করেছেন।

## হেগেল, ফয়েরবাখ ও মার্কসীয় দর্শন

১৮৪২-১৮৪৩-এ মার্কসের যৌথ গবেষণার প্রথম ফসল, যা প্রথম হেগেল ও ফয়েরবাখের দর্শন থেকে প্রস্থান ঘোষণা করে, তা হল, 'The Holy Family'। প্রকাশিত হয় ১৮৪৪-এর সেপ্টেম্বরে। পরবর্তীতে অনেক বেশী পূর্ণতা ও স্বতন্ত্র্য নিয়ে মার্কসীয় দর্শন প্রকাশিত হয়। Engels রচিত Anti-Duhring এবং Ludwig Feuerbach and the End of Classical German philosophy.

আমরা এখানে কার্ল মার্কস-এর লেখা 'Economic and Philosophical Manuscript of 1844' থেকে আলোচনা শুরু করব। Critique of Hegel's Philosophy in General নামক অধ্যায়ে মার্কস আলোচনা শুরু করেছেন, তার হেগেলীয় গ্রুপের দুই বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু Bruno Bauer এবং Strauss-এর সমালোচনার মাধ্যমে। হেগেলের 'দ্বন্দ্বতত্ত্ব' (dialectic) সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে, এ প্রসঙ্গে মার্কস লিখেছেন— সামগ্রিকভাবে হেগেলের দর্শন এবং বিশেষভাবে হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বের সাথে আধুনিক সমালোচনার সম্পর্ক কি, এ প্রশ্নে Strauss এবং Bruno Bauer হেগেলীয় যুক্তিবিজ্ঞান (logic)-এর মধ্যে আটকে রয়েছেন। Strauss পুরোপুরি এবং Bruno প্রচ্ছন্নভাবে হেগেলীয় যুক্তি বিজ্ঞানের মধ্যেই বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ, Strauss-কে সমালোচনা করতে গিয়ে Bruno Bauer 'বিমূর্ত প্রকৃতি'-র সারবস্তুকে 'বির্মূত মানুষ'-এর 'আত্মচেতনা' দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছেন (Bauer রচিত Synoptiker এবং Das entdeckte Christenthum গ্রন্থে)।

মার্কস লিখেছেন এদের দু'জনের কেউই হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব, যা তরুণ হেগেলবাদের জননী, তার সাথে চূড়ান্ত ফয়সালা করতে প্রস্তুত নয়। অন্যদিকে Feuerbach-ই একমাত্র হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমালোচনামূলক অবস্থান নিতে পেরেছেন এবং এই ক্ষেত্রে খাঁটি আবিষ্কার সমূহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মার্কসের মতে—

> "তিনি হলেন সত্যিই একজন প্রকৃত বিজয়ী যিনি পুরাতন দর্শন-কে পরাজিত করেছেন।"

ফয়েরবাখের মূল কৃতিত্ব হল:

(১) এটা প্রতিষ্ঠা করা যে দর্শন হল 'চিন্তায় পরিণত করা ধর্ম এবং চিন্তাদ্বারা ব্যাখ্যাত।'

(২) মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে এবং তত্ত্বের মৌলিক নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকৃত বস্তুবাদ এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা।

(৩) নেতির নেতিরকরণকে পরম ইতিবাচকতা, স্বয়ম্ভর ইতিবাচকতা, আত্মনির্ভর ইতিবাচকতা হিসেবে দেখার ভ্রান্তিকে সূচিত করা।

মার্কস লিখেছেন—

> "ফয়েরবাখ 'নেতির নেতিকরণ'-কে কল্পনা করতেন শুধুমত্র দর্শনের নিজের সাথে দ্বন্দ্ব হিসেবে—একটি দর্শন হিসেবে যেটি ঈশ্বরতত্ত্ব-এর যথার্থতাকে সমর্থন করে, প্রথমে তাকে অস্বীকার করার পরে এবং অতএব তাকে সমর্থন করে নিজের বিরুদ্ধে।
>
> "যেহেতু হেগেল 'নেতির নেতিকরণ'-কে কল্পনা করেছিলেন, (তার ভিতর সহজাত ধনাত্মক সম্পর্ক-এর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে) সত্যি এবং একমাত্র ইতিবাচক হিসেবে; এবং তার ভিতর সহজাত ঋণাত্মক সম্পর্ক-এর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, তাকে কল্পনা করেছিলেন একমাত্র সত্যি এবং স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াহিসেবে; সেহেতু, তিনি ইতিহাসের গতিপথ সম্পর্কে একটি বিমূর্ত, যুক্তিসঙ্গত, সুদূরকল্পিত বর্ণনা পেয়েছিলেন, যা আসলে মানবজাতির আসল নিজস্ব ইতিহাস নয়, কিন্তু শুধুমাত্র মানবজাতির সৃষ্টির ক্রিয়া, মানুষের সৃষ্টির ইতিহাস।"

হেগেলের 'Phenomenology' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে মার্কস লিখেছেন যে হেগেল 'দ্বৈত ভ্রান্তি' ঘটিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রথমতঃ সম্পদ, রাষ্ট্রক্ষমতা ইত্যাদি হেগেলের কাছে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন সত্তা। এগুলি সব চিন্তা সত্তা এবং তাই এগুলি নিছকই এক বিশুদ্ধ, বিমূর্ত দর্শনের বিচ্ছিন্ন রূপ। সমগ্র প্রক্রিয়াটি শেষ হয় চরম, অনপেক্ষ জ্ঞানে। সঠিকভাবে বললে, এগুলি বিমূর্ত চিন্তা থেকে তৈরী হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া (estranged) বস্তু যা, তাদের বাস্তবতার অনুমানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। দার্শনিক নিজেই বিচ্ছিন্ন মানুষের বিমূর্ত আকার, নিজেকে গ্রহণ করেন বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর মাপকাঠি হিসেবে। সুতরাং, বিচ্ছিন্নতা-প্রক্রিয়ার সমগ্র ইতিহাস-টি এবং তার প্রত্যাহারের প্রক্রিয়াটি হচ্ছে বিমূর্ত, অনপেক্ষক-এর জন্মদান-এর ইতিহাস। এই বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে চেতনা নিরপেক্ষ এবং সচেতন বস্তুসত্তার, চেতনা এবং আত্মচেতনার, বিষয় এবং বিষয়ীর বিরোধ। আসলে এই বিরোধ-টা পুরোটাই হচ্ছে প্রকৃত ইন্দ্রিয় চেতনার বিরোধ নিয়ে। মার্কস লিখেছেন—

> "এই বিরোধগুলির মধ্যে অন্যান্য আরো বিরোধগুলি আর কিছুই নয়, শুধুমাত্র আরো অপবিত্র বিরোধগুলির বাহিরের রূপ এবং আকার"
>
> "The human character of nature and of the nature created by history– man's products."

দ্বিতীয়তঃ হেগেলের কাছে শুধু মনই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত সত্তা, যেখানে মনের প্রকৃত আকৃতি হচ্ছে চিন্তায়ত মন, ধর্মতাত্ত্বিক মন, সুদূরকল্পী মন। অন্যদিকে, মানুষের কাছে বাস্তব পৃথিবী অন্যভাবে উপস্থিত নয়। মানুষের এই ধারণা হয় যে, ইন্দ্রিয় চেতনা আসলে বিমূর্ত ইন্দ্রিয় চেতনা নয়, বরং মানবিক ইন্দ্রিয় চেতনা। তাই ধর্ম, সম্পদকে তারা গ্রহণ করে মানবিক বস্তুভবন হিসেবে, মানুষের ক্রিয়াশীল মূলগত শক্তির শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন জগত হিসেবে— তাই সেটা মানুষের কাছে প্রকৃত মানবিক পৃথিবীর একমাত্র গন্তব্য। এই উপলব্ধি বা 'অন্তর্দৃষ্টি' হেগেলের চিন্তায় এই রূপ নেয় যে— ইন্দ্রিয়, ধর্ম, রাষ্ট্রশক্তি ইত্যাদি হচ্ছে 'আধ্যাত্মিক সত্তা'।

মার্কস লিখেছেন—

> "প্রকৃতির মানবিক গুণ এবং মানুষের সৃষ্টি ইতিহাসের প্রকৃতি এমনভাবে দৃশ্যমান হয় যেন তারা বিমূর্ত মনেরই সৃষ্টি। সেই জন্য তাদের মন-চিন্তা-সত্তার বিভিন্ন পর্যায়সমূহ বলে মনে হয়। হেগেলের Phenomenology তাই একটি গুপ্ত, রহস্যাবৃত এবং অনিশ্চয়তাপূর্ণ বিচারধারা। কিন্তু যে পরিমাণে তা মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে (estrangement) বর্ণনা করে, যদিও মানুষ শুধুমাত্র মন হিসেবেই আবির্ভূত হয়, তার মধ্যে বিচারের সমস্ত উপাদান লুক্কায়িত থাকে, যেগুলি আবার প্রায়শই হেগেলীয় মতবাদের ঊর্ধ্বে উঠে ইতিমধ্যেই তৈরী করা এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'অসুখী চেতনা', 'সৎ চেতনা', 'মহৎ এবং হীনচেতনা'র সংগ্রাম ইত্যাদি পৃথক পৃথক অংশগুলি ধর্ম, রাষ্ট্র,

নাগরিক জীবন প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রের বিচারমূলক উপাদানগুলিকে ধারণ করে, যদিও তা করে বিচ্ছিন্ন আকারে (in an estranged form)। ঠিক যেমন সত্তা, বস্তু ইত্যাদি আবির্ভূত হয় চিন্তা-সত্তা হিসেবে, তেমনি বিষয়ী (subject) হচ্ছে সব সময়ই চেতনা অথবা আত্ম-চেতনা, বরং বলা যায় মানুষ আবির্ভূত হয় কেবল আত্ম-চেতনা হিসেবে। বিচ্ছিন্নতার সুস্পষ্ট আকারগুলি যা দৃশ্যমান হয়, তাই কেবলমাত্র চেতনা এবং আত্মচেতনার বিভিন্ন আকার। ঠিক যেমন বিমূর্ত চেতনা নিজেই [যে আকারে বিষয় (object) গঠিত হয়] আত্মচেতনার প্রভেদসূচক একটি মুহূর্ত, যা এই পরিক্রমার ফল হিসেবে আবির্ভূত হয় তা চেতনার সঙ্গে আত্মচেতনার অভিন্নতা— অনপেক্ষ জ্ঞান— বিমূর্ত চিন্তার পরিক্রমা, যা আর নিজস্ব সত্তার দিকে চালিত নয়, বরং যা এখন নিজস্ব সত্তার মধ্যেই সঞ্চরমান। অর্থাৎ এর ফল হচ্ছে বিশুদ্ধ চিন্তার দ্বান্দ্বিকতা।

অতি সংক্ষেপে এই হল ১৮৪৪-এ মার্কসের চোখে হেগেল।

হেগেল সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের অনেক বেশি পরিণত ও পূর্ণাঙ্গ ভাবনা আমরা পাই Engels রচিত "Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy"–গ্রন্থে। গ্রন্থটির মুখবন্ধে এঙ্গেলস জানিয়েছেন, মার্কস ১৮৫৯-এ বার্লিন থেকে প্রকাশিত 'A Contribution to the Critique of Political Economy'-এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন ১৮৪৫-এ মার্কস ও এঙ্গেলস, যৌথভাবে কাজ শুরু করেছিলেন। "আমাদে দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধতা অভিন্নভাবে গড়ে তোলার জন্য।" এঙ্গেলসের ভাষায়—

> "ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, যাকে মূলত মার্কস্ই বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলেন জার্মান দর্শনের আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীতে, আমাদের তৎকালীন দার্শনিক নীতি-বোধের সাথে বোঝাপড়া করার উদ্দেশ্যে।"

সেই সময়ে দু'জনের সেই মহান যৌথ প্রচেষ্টা, (The German Ideology) তখনকার ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে। তারপর ৪০ বছরে আর কোনো উদ্যোগ মার্কস-এঙ্গেলস-এর পক্ষে নেওয়া হয়নি, যাতে হেগেল এবং ফায়েরবাখ সম্পর্কে তাদের সার্বিক ও সামগ্রিক অবস্থান-টি স্পষ্ট হয়। মুখবন্ধের শেষদিকে এঙ্গেলস লিখছেন—

> "এই লাইনগুলোকে প্রেসে পাঠাবার আগে আমি আরও একবার খুঁজে বার করে ১৮৪৫-৪৬-এর পুরোনো পাণ্ডুলিপিটা 'জার্মান দর্শন' দেখলাম। ফয়েরবাখ-কে নিয়ে যে অংশটি লেখা, সেটি এখনো অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ অংশটির মধ্যে রয়েছে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার একটি বর্ণনা, যেটা প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সে সময়ে কত অসম্পূর্ণ ছিল। তার মধ্যে ফয়েরবাখ-এর মতবাদ নিয়ে কোনো সমালোচনা ছিল না; অতএব বর্তমান ব্যবহারের জন্যে সেটি অযোগ্য।"

এঙ্গেলসের চোখে, Heinrich Heine হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তিত্ব, যিনি হেগেলের দর্শনের বৈপ্লবিক মর্মবস্তুকে ১৮৩৩-এ মত সময়ে উদ্ধার করেছিলেন। হেগেলের যে বিখ্যাত উদ্ধৃতিটি সংকীর্ণমনা সরকার এবং উদারপন্থীদের কাছ থেকে সবচেয়ে প্রশংসা পেয়েছিল, তা হল—

> "যা কিছু বাস্তব তাই যুক্তিপূর্ণ এবং যা কিছু যুক্তিপূর্ণ তাই বাস্তব।"

এর অর্থ এমন করা হয়েছিল যে চলমান যে কোনো একটি সমাজে যা কিছু অন্যায়, অনৈতিক, অপরাধমূলক—তা সবই যৌক্তিক, কারণ তা-ই বাস্তব। তৎকালীন জার্মান শাসককূল, বিশেষতঃ Frederick William III এবং তার অনুগামীরা হেগেলের বক্তব্যকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। "কিন্তু", এঙ্গেলস লিখেছেন, "হেগেলের মতে যা কিছু অস্তিত্বশীল তার সবটাই বাস্তব— তা কিছু সীমিতকরণ ছাড়া সত্য নয়।" হেগেলের ভাষায়—

> "বিকাশের পথ ধরে বাস্তবতা প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।"

হেগেল নিজেই একটা উদাহরণ দিয়েছেন—ধরা যাক একটি সরকার একটা বিশেষ নির্দিষ্ট কর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করল। ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে, কোনো কিছুই না দেখে শুধু এই ঘটনাকেই বাস্তব হিসেবে দেখতে হবে। বরং এটা যদি প্রয়োজনীয় না হয়ে থাকে তবে সময়ের সাথে সাথে ঐ 'কর নিয়ন্ত্রণ'টি বাতিল বা পরিবর্তন হবে। বাস্তবের মধ্যে এভাবে অবাস্তবও থাকে। এঙ্গেলস লিখছেন—

> "যে জিনিসটা প্রয়োজনীয়, সেটা শেষ পর্যন্ত নিজেকে যুক্তিপূর্ণ হিসেবে প্রমাণ করে। যদি হেগেলীয় তত্ত্ব তৎকালীন প্রাশিয়ার রাষ্ট্রযন্ত্রে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে তার অর্থ শুধুমাত্র হয় যে এই রাষ্ট্র হল যুক্তিপূর্ণ, যুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ সেটি হল প্রয়োজনীয়। যদিও সেটি আমাদের কাছে মন্দ রূপে দেখায়, তা সত্ত্বেও, যদি সে তার অশুভ চরিত্র নিয়ে বিরাজ করে, তাহলে রাষ্ট্রের অশুভ চরিত্র-এর ন্যায্যতা প্রতিপাদিত হয় এবং তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় প্রজাদের একই রকম অশুভ চরিত্র-এর দ্বারা। তৎকালীন সময়ের প্রাশিয়ানরা তাদের নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী সরকার পেয়েছিল।"

হেগেলের চিন্তাধারা অনুযায়ী রোমান রিপাবলিক বাস্তব, কিন্তু ততটাই বাস্তব রোমান সাম্রাজ্য, যা রিপাবলিক খারিজ করে দিয়েছিল। ১৭৮৯-তে ফরাসী রাজতন্ত্র এতটাই অবাস্তব ছিল যে, এর সব প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছিল, এতটাই অযৌক্তিক হয়ে গেছিল যে তাকে বিপ্লবের মাধ্যমে ধ্বংস করতে হয়েছিল, যে বিপ্লব সম্পর্কে হেগেল প্রবল উৎসাহ নিয়ে মন্তব্য করেছেন। এক্ষেত্রে, তাই, রাজতন্ত্র হল অবাস্তব এবং বিপ্লব হল বাস্তব। এভাবেই কোনো একটা সময় যা প্রয়োজনীয়, বা real, সময়ের সাথে সাথে তা তার প্রয়োজনীয়তা হারায়, তার থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলে, হয়ে পড়ে পুরোপুরি অযৌক্তিক এবং অবাস্তর, মুমূর্ষু। বাস্তবতার জায়গায় কার্যকরী বাস্তবতা আসে শান্তিপূর্ণভাবে যদি 'পুরাতন' তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়েছে বুঝে জায়গা ছেড়ে দেয়। অপর দিকে বিপ্লব হয়ে ওঠে বলপূর্বক, যদি পুরোনো নতুনের আবির্ভাবকে জোর করে অস্বীকার করতে চায়।

এইভাবে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতা দেখিয়ে দেয় কীভাবে হেগেলীয় প্রস্তাবনা নিজেই নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এঙ্গেলস লিখেছেন—

> "হেগেলীয় পদ্ধতির চিন্তার নিয়মাবলী অনুযায়ী, যা বাস্তব, তা-ই যুক্তিপূর্ণ— এই তত্ত্ব নিজেকে রূপান্তরিত করে অন্য একটি তত্ত্বে: যা কিছু বাস্তবে বিরাজ করে, তা-ই ধ্বংসের যোগ্য।"

হেগেলের দ্বান্দ্বিক দর্শন-কে এঙ্গেলস যখন আরও সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্ট করে তুলেছেন, তিনি লিখছেন—

> "যেমনভাবে জ্ঞান কখনো মানবসভ্যতার একটি নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারবে না, একইভাবে ইতিহাস-ও কখনও তা পারবে না; একটি নিখুঁত শ্রেষ্ঠ সমাজ, নিখুঁত অবস্থা, এগুলি শুধুমাত্র কল্পনাতেই বিরাজ করতে পারে, অন্যদিকে, সকল ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ব্যবস্থা মানব সমাজের নিচু থেকে উচু পর্যায়ের অন্তহীন বিকাশের পথে অল্পকালস্থায়ী ধাপ।"

এঙ্গেলস হেগেলের দর্শন থেকে যে দ্বান্দ্বিকতার নির্যাস বের করে নিচ্ছেন, তাতে—

"দ্বান্দ্বিক দর্শনে কোনোকিছুই অন্তিম, শ্রেষ্ঠ, সর্বোপরি বা পবিত্র নয়। এই দর্শন সবকিছুর এবং সবকিছুর মধ্যে অচিরস্থায়ী চরিত্র-কে চিহ্নিত করে; কোনোকিছুই তার সামনে টিকতে পারে না শুধুমাত্র গঠন এবং ধ্বংসের এই অব্যাহত ঘটনাবলী ছাড়া, নিচু থেকে উঁচুপর্যায়ের এই অন্তহীন উত্থান ছাড়া, এবং দ্বান্দ্বিক দর্শন চিন্তাশীল মননে এই ক্রিয়ার প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।"

স্বাভাবিকভাবেই, এঙ্গেলস শেষ পর্যন্ত হেগেলের কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসেন।

হেগেল কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন? তিনি তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে পরিণতি-তে নিয়ে যেতে পারেন না। তার কারণ সমাজের এই পরিবর্তনসমূহ সমাজের মধ্যেকার কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা থেকে তৈরী হয় না। তৈরী হয় 'মনন' বা 'প্রাণসত্তা'র মধ্যে তৈরী হওয়া প্রয়োজনের প্রতিফলন হিসেবে। তাঁর ভাষায় চিন্তারত মন, তার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সমাজে রূপায়িত করে নেয়। এঙ্গেলস লিখেছেন—

"অতএব যতই হেগেল, তার 'যুক্তি' অনুযায়ী, বোঝানোর চেষ্টা করুন না কেন যে এই সনাতন সত্য আর কিছুই নয়, নিজেই হল যুক্তিপূর্ণ বা ঐতিহাসিক কার্যাবলী, তিনি দেখছেন যে তিনি নিজেই বাধ্য হচ্ছেন এই প্রক্রিয়ার একটি অন্তিম পর্যায় খুঁজে দিতে শুধুমাত্র এই কারণেই যে তাকে এই ব্যবস্থাকে কোনো এক পর্যায়ে শেষ করতে হবে। তার 'যুক্তি'-তে তিনি আবার এই অন্তিম পর্যায়-কে 'আরম্ভ' বানাতে পারবেন কারণ এখানে উপসংহারের পর্যায়টি, যা হল সর্বোপরি পরম ধারণা সেটা পরম শুধুমাত্র এই কারণে যে তার ব্যাপারে হেগেলের একেবারেই কিছু বলার নেই, তা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অর্থাৎ তা নিজেকে প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করে এবং পরে আবার চিন্তায় ফিরে আসে, মননে এবং ইতিহাসে।"

হেগেলীয় চিন্তার সীমাবদ্ধতাগুলি সংক্ষেপে এঙ্গেলস প্রকাশ করলেন এইভাবে,

"যখন বস্তুবাদ প্রকৃতিকে ধারণ করে একমাত্র বাস্তব হিসেবে, হেগেলীয় মতবাদে প্রকৃতি হল শুধুমাত্র পরম ভাব-এর 'বিচ্ছিন্নতা'। কার্যতঃ চিন্তা এবং চিন্তার ফল ভাব হল এখানে প্রাথমিক। প্রকৃতি হল একটি উদ্ভূত বস্তু, যা বাস্তবে বিরাজ করে শুধুমাত্র ভাব-এর সদয়তা এবং দাক্ষিণ্যের জন্যে, এবং এই দ্বন্দ্বে তারা যতটা সম্ভব ততটা নাকানি চোবানি খায়।"

হেগেলীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বস্তুবাদী দর্শনের দিক থেকে সবচেয়ে জোরালো আক্রমণ প্রথম এসেছিল Feuerbach-এর 'Essence of Christianity' গ্রন্থে। ফয়েরবাখের বক্তব্য: সমস্ত দর্শন-নিরপেক্ষভাবেই প্রকৃতি অস্তিত্বশীল। আমরা প্রকৃতির উৎপন্ন হিসেবে প্রকৃতির কোলেই বড় হয়েছি। প্রকৃতি এবং মানুষের বাইরে কিছু নেই। যে সব ধর্মীয় কল্পনাগুলো আমাদের মস্তকে তৈরী হয়েছে সেগুলি আমাদের চিন্তার, আমাদের নিজস্ব 'নির্যাস'-এর অসাধারণ প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। ফয়েরবাখের এই রচনার প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়াল। এঙ্গেলসের কলমে—

"সম্মোহন ভেঙে গিয়েছে, 'ব্যবস্থা' চুরমার হয়ে গেছে এবং তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যে শুধুমাত্র আমাদের কল্পনায় বিরাজ করে বলে দেখানো হয়েছিল, তার অবলুপ্তি ঘটেছে।"

"উৎসাহ ছিল সার্বিক; আমরা সবাই তৎক্ষণাৎ হয়ে গেলাম ফয়েরবাকের অনুগামী। এই নতুন ধারণাকে মার্কস কি উৎসাহ ভরে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও কিভাবে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা বোঝার জন্য একজনকে 'Holy Family' পড়তে হবে।"

ফয়েরবাখ ১৮৩৯-এ তার 'Principles of the Philosophy of the Future' গ্রন্থে হেগেলের সমালোচনা করে লিখলেন—

"হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার গোপন কথা, শেষ বিচারে, এর মধ্যেই নিহিত আছে যে তা ধর্মতত্ত্বকে দর্শন দ্বারা নাকচ করে, এবং দর্শনকে ধর্মতত্ত্ব দ্বারা নাকচ করে।"

ফয়েরবাখের মতে স্পিনোজা যেমন ঈশ্বরের নাম দিয়েছিলেন 'প্রকৃতি', হেগেল তেমনি ঈশ্বরের নাম দিয়েছেন ভাব। চিন্তা এবং সত্তার অভিন্নতার প্রশ্নে ফয়েরবাখ হেগেলের সাথে সহমত; কিন্তু ফয়েরবাখ মনে করেন হেগেল এটা প্রমাণ করেছেন শুধুমাত্র চিন্তার অভ্যন্তরে (only within thought)। ফয়েরবাখের বক্তব্য হল মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির কাজই হল বস্তুকে প্রতিফলিত করা, একইভাবে মস্তিষ্কের কাজ হল পৃথিবীকে ধারণায় প্রতিফলিত করা। চিন্তা এবং সত্তার অভিন্নতাকে তাই জীববিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে হবে, দর্শনের সাহায্যে নয়।

'Essence of Christianity'-তে ফয়েরবাখ দেখানোর চেষ্টা করেছেন কীভাবে অসংখ্য সাধারণ মানুষ-এর জীবন থেকেই খ্রিস্টধর্মের কাহিনিগুলো গড়ে উঠেছে। জীবন থেকে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনতা থেকেই যে ধর্মের, দর্শনের ধারণাগুলোর উৎপত্তি, ফয়েরবাখের প্রচেষ্টা সে ক্ষেত্রে বস্তুকে, প্রকৃতি-কে প্রাথমিক অবস্থানে টেনে আনতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

মার্কস 'Thesis on Feuerbach' (১৮৪৫) লিখেছিলেন, যাতে রয়েছে ফয়েরবাখের দার্শনিক ধারণাগুলি সম্বন্ধে তাঁর ক্ষুদ্র কিন্তু স্পষ্ট সমালোচনা। এই রচনা প্রকাশিত হয়, এঙ্গেলস রচিত Ludwig Feuerbach... (১৮৮৩)-এর সাথে পরিশিষ্ট হিসেবে। 'Theses on Feuerbach' নামটিও এঙ্গেলসের দেওয়া, তার-ই হাতে সম্পাদিত হওয়া প্রকাশনা। ১১টি ছোট ছোট অনুচ্ছেদে ১৮৪৫-এ মার্কস ফয়েরবাখ সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার সারসংক্ষেপ হল—

আগেকার সমস্ত বস্তুবাদীদের মতন ফয়েরবাখেরও মূল ভ্রান্তি এই যে তিনি বস্তু, বাস্তবতা, ইন্দ্রিয় চেতনাকে বস্তু-র আকারেই, এদের অন্তর্গত অস্তিত্বের দিকটিকেই শুধু গ্রহণ করেছেন, কখনই তাকে মানুষের ইন্দ্রিজ কার্যকলাপ, মানুষের অনুশীলন (practice) হিসেবে বিষয়ীগতভাবে গ্রহণ করেননি। এই দিকটিকে, মানুষের সচেতন, সক্রিয় ক্রিয়াকলাপকে বরং সামনে এনেছে ভাববাদ। কিন্তু, স্বাভাবিকভাবেই ভাববাদ শুধু বিমূর্তভাবেই তা করেছে; কারণ ভাববাদ সত্যিকার ইন্দ্রিয়জ কার্যকলাপকে হিসেবের মধ্যে আনে না। 'The Essence of Christianity' গ্রন্থে শুধু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা দৃষ্টিভঙ্গী (Theoretical attitude)-কেই প্রকৃত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আর অনুশীলন (practice)-কে চিত্রিত করেছেন 'নোংরা-ইহুদীয়' ধরনের 'রূপ' হিসেবে। তাই তিনি কখনওই 'বিপ্লবী', 'বাস্তব বিচারমূলক' কার্যকলাপের তাৎপর্যকে ধরতে পারেন নি।

মার্কসের ভাবনায়, যে বস্তুবাদী বীক্ষা এটা বলে যে মানুষ তার পরিস্থিতি এবং লালন-পালনের ফসল, সে এটা ভুলে যায় যে, মানুষই পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করে এবং শিক্ষককে অবশ্যই নিজেকে শিক্ষিত করতে হয়। পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত করা এবং মানবিক কার্যকলাপ বা আত্মপরিবর্তনের সমাপতনকে কেবলমাত্র বিপ্লবী অনুশীলন হিসেবেই যৌক্তিকভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ফয়েরবাখ বিমূর্ত চিন্তায় সন্তুষ্ট নন, তিনি চান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচার, গ্রহণযোগ্যতা। কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে বাস্তব, মানবিক, ইন্দ্রিয়জ

ক্রিয়াকলাপ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী নন।

ফয়েরবাখ 'ধর্মের নির্যাস'কে সমাধা করেন, দেখতে চান মানুষের নির্যাস (মনুষ্য প্রকৃতি) হিসাবে। কিন্তু 'মানুষের নির্যাস' একজন ব্যক্তি মানুষের মধ্যে বিমূর্ত আকারে নেই। তা আসলে, সামাজিক সম্পর্কগুলোর (social relations) এক ঘনীভূত রূপ। এবং তাই ফয়েরবাখ যা বুঝতে পারেননি, তা হল ধর্মীয় সংবেদনশীলতা নিজেই একটি সামাজিক ব্যবস্থার উৎপাদিত ফল এবং ফয়েবাখের চিন্তার সূত্র ধরে বিছিন্ন, বিমূর্ত ব্যক্তির যে ধারণা পাওয়া যায় তাও আসলে এক বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার ফসল। মার্কসের মতানুসারে, সমগ্র সমাজজীবনই ব্যবহারিক। সকল রহস্য যাবতীয় অব্যাখ্যাত বিষয়সমূহ মানবজীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এক যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান লাভ করে।

যে বস্তুবাদ ইন্দ্রিয়চেতনাকে এক বাস্তবিক ঘটনা হিসাবে, মানুষের এক সক্রিয় ভূমিকা হিসাবে স্বীকার করে না প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তিকেই কেবল খুঁজে পায়। এটি খুঁজে পায় এক সুশীল সমাজকে। পুরোনো বস্তুবাদ তাই কেবল সুশীল সমাজকেই গুরুত্ব দেয়। আর নব্য বস্তুবাদ গুরুত্ব দেয় মানব সমাজকে বা সামাজিক মানবতাবাদকে।

মার্কস একাদাশ থিসিসে তার জগদ্বিখ্যাত মন্তব্যটি করেন—

> "দার্শনিকরা আজ পর্যন্ত পৃথিবীকে কেবল নানাভাবে ব্যাখ্যাই করে গেছেন। যা প্রয়োজন, তা হল পৃথিবীকে পরিবর্তন করা।"

মার্কস ও এঙ্গেলস্ একত্রে 'জার্মান ইডিওলজি' গ্রন্থে ফয়েরবাখের 'বস্তুবাদ'-এর পর্যালোচনা করেন। তাঁরা লেখেন—

> "আমরা কেবল একটি বিজ্ঞানই জানি। তা হল ইতিহাসের বিজ্ঞান। ইতিহাসকে কেউ দুই দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং একে প্রাকৃতিক ইতিহাস ও মানবেতিহাস— এই দুইভাগে ভাগ করতে পারেন। কিন্তু এই দুই ইতিহাস অবিচ্ছেদ্য। যতদিন মানবসভ্যতার অস্তিত্ব রয়েছে ততদিন পর্যন্ত প্রাকৃতিক ইতিহাস মানবেতিহাস থেকে বিমুক্ত নয়।"

মার্কস ও এঙ্গেলস্ বর্ণিত "জার্মান ইডিওলজি"-তে এঙ্গেলস্ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবসমাজের বিবর্তনের ইতিহাসের অবিচ্ছিন্নতা ও আন্তঃসম্পর্ককে আরও বিশদে বর্ণনা করেন।

ফয়েরবাখের লেখনীর সর্বাপেক্ষা জটিল দিকটি হল ইন্দ্রিয়চেতনার জগৎ সম্পর্ক তাঁর ধারণা, বিশ্লেষণ ও সর্বোপরি অবস্থান। এ প্রসঙ্গে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় ফয়েরবাখের দর্শনও হেগেলীয় দর্শনের মতো এক শক্তিশালী বস্তুবাদী দর্শন হিসেবে নিজেকে হাজির করবে। এবং এইভাবে এটি মার্কসবাদী দর্শন ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অযথা স্থান দখল করে একে এক যান্ত্রিক বস্তুবাদে অধঃপতিত করবে।

'জার্মান ইডিওলজি'-তে আমরা পাই—

> "ইন্দ্রিয় চেতনার জগৎ সম্পর্কে ফয়েরবাখের ধারণা কখনও কেবল এক ভাবনা, কখনও কেবল অনুভূতি। তিনি মানুষের পরিবর্তে এক "প্রকৃত ঐতিহাসিক মানুষ"-এর কথা বলেন। মানুষ এখানে আসলে একজন 'জার্মান'। প্রথম ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার জগৎ সম্পর্কিত ভাবনায় যে সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে তার চেতনা ও অনুভূতির সংঘাত ঘটে তাদের লঘু করে দেখেন। তিনি লঘু করে দেখেন সেই সমস্ত বিষয়কে যা তার পূর্বনির্ধারিত ভাবনার সঙ্গে খাপ খায় না। এমন একটি বিষয় হল মানুষ ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ক। সমস্যা এড়াতে তিনি এক অপবিত্র দ্বৈত ধারণার জগতে প্রবেশ করেন। এহেন জগতে তাঁর দুটি দৃষ্টি। একটি দৃষ্টি মারফৎ তিনি নিতান্ত স্পষ্ট বিষয়গুলিকে দেখতে পান আর অপর এক উচ্চতর দার্শনিক দৃষ্টি মারফৎ তিনি দেখেন বস্তুসমূহের প্রকৃত স্বরূপ। তিনি দেখতে পান যে তার চারপাশের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু জগৎ কোন এক অসীম থেকে আগত অপরিবর্তনীয় এক জগৎ নয়। এটি হল শিল্প-অর্থনীতি-রাষ্ট্র-সমাজের এক সম্মিলিত ফল এবং প্রকৃতই এক ঐতিহাসিক উৎপাদন যা বহু প্রজন্মের সম্মিলিত শ্রমের ফল। একটি প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় এর শিল্প ও সামাজিক আন্তঃসম্পর্ককে বহন করে নিয়ে যায় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে। 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা'র সামান্যতম বস্তু ও সামাজিক বিকাশ, শিল্প ও ব্যবসায়িক আন্তঃসম্পর্কের এক গূঢ় সত্যকে উপস্থাপন করে। অন্যান্য ফলের গাছের মতোই চেরিফলের গাছও আজও সকলের কাছে পরিচিত। অথচ এটি মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে আমাদের অঞ্চলে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রথম উৎপাদন করা হয়েছিল। আর এভাবেই এক বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজ ফয়েরবাখের কাছে কেবল এক 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতায়' রূপান্তরিত হয়।"

ফয়েরবাখের দৃষ্টিকোণের বস্তুবাদী দিকটি সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস্ বলেন—

> "যখন ফয়েরবাখ নিজে একজন 'সাধারণ মানুষ' হওয়ার সুবাদে নিজেকে কমিউনিস্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেন তখন বোঝা যায় তিনি কত স্পষ্টভাবে নিজেকে প্রতারিত করছেন। কারণ তিনি ভাবছেন কোনো এক প্রকৃত বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সদস্যপদের সংজ্ঞাকে নিছকই এক বর্গে রূপান্তরিত করতে পারবেন। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে ফয়েরবাখের একমাত্র সিদ্ধান্ত— মানুষের পরস্পরকে প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন সর্বদাই বিরাজমান থাকবে। এভাবে তিনি অন্যান্য তাত্ত্বিকদের মতোই এমন এক বিষয়ে নিজ সচেতনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান যে বিষয়ে সকলে ইতোমধ্যেই সচেতন। এভাবে তিনি স্থিতাবস্থার পক্ষেই সওয়াল করেন এবং প্রকৃত কমিউনিস্টদের কাজ হল স্থিতাবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।"

## দর্শন, বিজ্ঞান ও মার্কসবাদ

এঙ্গেলস্ "লুডউইগ ফয়েরবাখ এবং ..." বইতে দার্শনিকদের মূলত দুই ভাগে ভাগ করেন— ভাববাদী ও বস্তুবাদী। এভাবে তিনি এমন এক কেন্দ্রীয় বিতর্কের জন্ম দেন যা এঙ্গেলসের মৃত্যু থেকে আজ পর্যন্ত সমানভাবে চর্চিত। চেতনা ও বস্তুর সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নটিকে সরিয়ে রাখলেও যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল আমাদের ভাবনা কিভাবে দৃশ্যমান জগৎ ও তার প্রকৃত রূপের সঙ্গে সম্পর্কিত। পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে আমাদের চেতনা উৎসারিত ছবিটি কি সত্য? দর্শনে এটিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশটি হল— "ভাবনা ও বস্তুর মধ্যেকার সাদৃশ্য"।

হেগেল ও ফয়েরবাখ সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা মার্কস ও এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাই। এ বিষয়ে কান্ট ও হিউম সম্পূর্ণ ভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। এঙ্গেলস্ দেখিয়েছেন যে হেগেল ও ফয়েরবাখ কান্ট ও হিউমকে নিজ নিজ দর্শনের পরিধির মধ্য থেকে যতটা সম্ভব বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত বিরোধিতা এবং তৎসহ সমাধান লুকিয়ে রয়েছে বাস্তবিক প্রয়োগ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে এবং সঠিক অর্থে বললে শিল্পের প্রকৃতিতে। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের লেখনীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশটি আমাদের পাঠ করা উচিত।

"তাদের কাছে, আধুনিকতরদের মধ্যে ছিলেন হিউম এবং কান্ট। তারা দর্শনের জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।"

"যদি আমরা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আমাদের ধারণাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি; যদি আমরা এটিকে নিজ অবস্থান বদল করে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে পারি তবে কান্ট বর্ণিত অস্পর্শনীয় বস্তুসত্তা নামক ধারণাটির পরিসমাপ্তি ঘটবে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে উৎপন্ন রাসায়নিক বস্তুসমূহ এহেন 'বস্তুসত্তা' রূপেই বিদ্যমান থাকে। এরপর যখন এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এরা একের পর এক উৎপাদিত ও রূপান্তরিত হতে শুরু করে তখন 'বস্তুসত্তা' তার আত্মকেন্দ্রিকতা ত্যাগ করে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। যেমন— ম্যাডার (এক ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ)-এর মূলে প্রাপ্ত এক ধরনের রাসায়নিক অ্যালজারিনকে আমরা আর ম্যাডার গাছে উৎপন্ন করি না। এটিকে অনেক কম খরচে ও সহজভাবে আলকাতরা থেকে উৎপন্ন করি। তিনশো বছর ব্যাপী কোপারনিকাস বর্ণিত সৌরজগৎ তার স্বপক্ষে ১০০, ১০০০, ১০০০০ ঃ ১ পরিমাণ সম্ভাবনা নিয়ে বিরাজমান ছিল। কিন্তু এটি ছিল নিছকই এক অনুমিতি। কিন্তু তারপর লেভেরিয়ার এই অনুমিতির মাধ্যমে এক অজানা গ্রহের উপস্থিতি প্রমাণ করলেন এবং মহাকাশে এহেন গ্রহের এক কল্পিত কক্ষপথের ছবিও আঁকলেন। যখন গ্যালিলিও এই গ্রহটিকে খুঁজে পেলেন (নেপচুন, বার্লিন অবজারভেটরী থেকে ১৮৪৬ সালে আবিষ্কৃত) তখন কোপারনিকাস সিস্টেম প্রমাণিত হল। যদিও জার্মানীতে নব্য কান্টবাদীরা কান্টের মতবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং ইংলন্ডে অজ্ঞেয়বাদীরা হিউমের মতবাদ বিষয়ে একই কাজ করছেন (সেখানে এটি কখনই উধাও হয়ে যায়নি), তবু তাদের তাত্ত্বিক ও বস্তুগত খন্ডণের সাপেক্ষে দীর্ঘদিন পূর্বেই তা অর্জিত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টির বিচারে এটি একটি পশ্চাদ্‌গমন এবং বাস্তবে এ হল জগতের সামনে অবজ্ঞা দেখিয়ে বস্তুবাদকে গ্রহণ করার চেষ্টা।"

এক শতাব্দীর অধিক সময় ধরে পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্যটি সম্পর্কে বিতর্ক চলছে। ১৯২৩ সালে লুকাচ্ রচিত "ইতিহাস ও শ্রেণিচেতনা" গ্রন্থে বর্ণিত এই উদ্ধৃতি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের এ বিষয়ে লেনিনের মত জেনে নেওয়া প্রয়োজন। "বস্তুবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা" গ্রন্থে লেনিন, মাখ-পন্থীদের অর্থাৎ বোগদানোভ, ভালেন্তিনোভ, বাজারোভ, চার্নভ প্রভৃতির সঙ্গে এ বিষয়ে বিতর্কে অংশ নেন। "বস্তুসত্তা" বিষয়ক প্লেখানভের ব্যাখ্যাটিকে জনগণ সমালোচনা করে। এই লেখাটিকে একই বিষয়ে এঙ্গেলসের আলোচনার লেখনীর টীকা রূপে দেখা যায়। অন্যতম ম্যাকিস্ট ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারদনিক ভিক্টর চার্নভ এঙ্গেলস্ বর্ণিত "বস্তুসত্তা" বিষয়ক ব্যাখ্যাটির প্রকাশ্য সমালোচনা করেন—

ভিক্টর চার্নভ তার বই "মার্কসবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শন"-এ মার্কস এঙ্গেলসের বিরোধিতা করার প্রচেষ্টা করেন। "লুড্‌উইগ" গ্রন্থে এঙ্গেলস্ লেখেন—

"আমাদের চেতনা প্রকৃত জগৎকে কি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম? আমাদের ধারণা ও ভাবনাসমূহ দিয়ে কি আমরা বাস্তব জগৎ-এর প্রকৃত প্রতিচ্ছবি পাই?"

চার্নভ প্লেখানভের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত অনুবাদের অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, এঙ্গেলস্ "প্রতিচ্ছবি" কথাটি লেখেননি। তিনি লিখেছিলেন "দর্পণে প্রতিফলন"।

লেনিন চার্নভকে উদ্ধৃত করে বলেন, "কোন নব্য কান্টীয় একথা ভেবে অভিভূত হয়ে পড়বেন না যে আমরা আলকাতরা থেকে আলিজারিন আরও সস্তায় ও সহজতর পদ্ধতিতে উৎপাদন করতে পারি। কিন্তু এই আলকাতরা থেকে আলিজারিন ব্যতীত আরও যা উৎপাদিত হয় তা হল "বস্তুসত্তা"-র ধারণার খন্ডন। এহেন আবিষ্কার কেবল নব্য কান্টীয়দের কাছেই নয়, সকলের কাছেই এক বিস্ময়কর আবিষ্কার।"

"কান্ট বস্তুসত্তাগত ধারণাটিকে অজ্ঞাত হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন— একথা জেনে এঙ্গেলস্ এই তত্ত্বকে এর বিপরীতে পরিণত করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন যা কিছু অজ্ঞাত তা সবই বস্তুসত্তা।"

লেনিন লেখেন এঙ্গেলস্-এর লেখা অনুবাদ করার সময় প্লেখানভ ও চার্নভ কান্টীয় অনায়ত্তশীল বস্তুসত্তার ধারণা থেকে অনায়ত্তশীলতাকে অযত্নে বাদ দেন। যাই হোক না কেন, চার্নভের লেখনীর বিরোধিতা করে লেনিন লেখেন—

"প্রথমত, এঙ্গেলস্ বস্তু সত্তার ধারণাটিকে বাতিল করার এক পদ্ধতি তৈরি করেন তা সত্য নয়। এঙ্গেলস্ স্পষ্টভাবেই বলেন তিনি কান্টের অনায়ত্তশীল বস্তুসত্তাকে পরিত্যাগ করছেন। চার্নভ বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কিত এঙ্গেলসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে মানবচৈতন্য নিরপেক্ষ ভাববাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। দ্বিতীয়ত, কান্টীয় তত্ত্বানুসারে বস্তুসত্তা অজ্ঞেয়। এর বিপরীত তত্ত্বানুযায়ী অজ্ঞেয়তাই হল বস্তুসত্তা। চার্নভ 'অজ্ঞেয়' শব্দটিকে 'অজ্ঞাত' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেন। কিন্তু তিনি একথা বুঝতে পারেননি যে এর মাধ্যমে তিনি আবারও এঙ্গেলসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে বিকৃত করেছেন।"

চার্নভের দৃষ্টিভঙ্গী পরীক্ষা করে আমরা বুঝতে পারি এহেন প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিকরা উপলব্ধি করতে পারেন না যে— এঙ্গেলস্ বস্তুসত্তার ধারণাটিকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। তবে এঙ্গেলস্ কোন্‌টিকে বাতিল করেছিলেন? তিনি বাতিল করেছিলেন কান্টের বস্তুসত্তা সম্পর্কিত অজ্ঞেয়তার ধারণাটি। এর অর্থ কি? এর অর্থ হল যে কোন বস্তু বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রথমত, একজন বস্তুবাদী হিসেবে এঙ্গেলস্ বস্তুসত্তার অস্তিত্বকে প্রশ্ন করতে পারেন না। এ বিষয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। চার্নভের মতে, এঙ্গেলস্ আলিজারিন-এর উদাহরণটির মাধ্যমে কান্টের অনায়ত্তশীল বস্তুসত্তার ধারণাটিকে বাতিল করেন। স্পষ্টতই অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাত হওয়ার প্রক্রিয়া এঙ্গেলসের মতে কান্টের অজ্ঞেয় বস্তুসত্তার ধারণাটির বিরোধী। এটি কেবল কান্টের চিন্তনের এক ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। যদি এঙ্গেলস্ একথা বলেন যে প্রকৃতিতে বহু অজ্ঞাত বস্তু রয়েছে যারা বৈজ্ঞানিক সন্ধানের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অর্থাৎ অজানা বস্তুকে আমরা জানতে পারি এবং ফলত, অজ্ঞেয় "বস্তুসত্তা" বলে কিছু হয় না, তবে আমরা বলতে পারতাম যে এঙ্গেলস্ কান্টের বক্তব্য বুঝতে পারেননি।

কিন্তু এঙ্গেলস্ একথা বলেননি। কারণ এবিষয় নিয়ে তিনি বহুদিন পূর্বেই চর্চা করেছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি এটি প্রথমবারের জন্য চর্চা করতে বসেননি। ১৮৪৫ সালেই তিনি ও মার্কস এ বিষয়ে 'জার্মান ফিলসফি' গ্রন্থে আলোচনা করেন।

এই আলোচনার সার বক্তব্য হল, যদি তুমি কোন বস্তু বিষয়ে প্রকৃত সত্য জানা যায় কিনা সে বিষয়ে প্রমাণ চাও তবে তোমাকে সে বস্তুটিকে ব্যবহার করতে হবে, তার পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং সেটিকে "নিজ প্রয়োজনে এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যা তোমার উদ্দেশ্য সম্মত (এলোমেলোভাবে কাজে লাগানো নয়)।

যদি এটি সামাজিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে একইভাবে কাজ করে এবং একই ফল দেয়, যদি এটি লক্ষ লক্ষ কোটি-কোটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিলে যায় তবে আমরা বলতে পারি যে বস্তু সম্পর্কিত সত্য বিষয়ে আমরা অবহিত হয়েছি; বস্তুসত্তা প্রকৃত অর্থে অজ্ঞেয় নয়। এটি ক্রমবিকাশমান।

এঙ্গেল্স লিখেছিলেন, আলকাতরা থেকে আলিজারিনের উৎপাদন প্রমাণ করে যে আমরা আলিজারিনকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছি। এঙ্গেলস্‌কে আরও বিশদে পড়লে আমরা জানতে পারি যে, প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে উৎপন্ন রাসায়নিক বস্তুসমূহকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করলেও বস্তুসত্তার পরিচয় বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি না। কিন্তু যেই জৈব রাসায়ন এই সকল বস্তুর উৎপাদন শুরু করে (যাবতীয় জটিল প্রক্রিয়া সমূহের মাধ্যমে) এবং আমরা এগুলির ব্যবহার শুরু করি তখনই এরা নিজেদের অজ্ঞেয়তাকে হারায়।

মার্কস বর্ণিত ফয়েরবাখের চতুর্থ থিসিস এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে। বস্তুসত্তার অজ্ঞেয়তাকে যদি আমরা রহস্যময়তা রূপে ধরে নিই তবে এই কথাগুলি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে— "সকল সামাজিক জীবনই অবশ্যম্ভাবী রূপে ব্যবহারিক। সকল রহস্য যা তত্ত্বকে রহস্যময়তার দিকে নির্দেশ করে, তা মানবজীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এক যুক্তি গ্রাহ্য সমাধান লাভ করে।"

এঙ্গেলসের মনে হয়েছিল, যে বস্তুটিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য উন্মোচিত করা হয়েছে তাকে আর বস্তুসত্তা বলা চলে না। এটি এক সর্বজনীন রূপ লাভ করে। আমরা বুঝতে পারি বস্তুটিকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। বস্তুটি আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে; হয়ে ওঠে এমন এক বস্তু যার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত। তখন থেকেই একটি তীব্র বিতর্ক জন্মলাভ করে।

বিতর্কটি লেনিনের "বস্তুবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা" গ্রন্থে শেষ হয়নি।

জর্জ লুকাচ্ "ইতিহাস ও শ্রেণিচেতনা" গ্রন্থে তাঁর সমালোচনাটি লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থে "বুর্জোয়া ভাবনার বিপ্রতীপে" অংশে তিনি লেখেন—

> "হেগেলের কাছে 'সত্তা' ও 'সর্বজনীনতা' কোনভাবেই পরস্পরের বিপরীত নয়। তারা ভীষণভাবে একাত্ম। হেগেলের মতে কোন কিছুর অস্তিত্বের অর্থ হল এটির এক সর্বজনীন সত্তা রয়েছে অর্থাৎ এটির অস্তিত্ব রয়েছে 'আমাদের জন্য'। বস্তুসত্তা ও তার সর্বজনীন সত্তার বিপরীত হল বস্তুর স্বকীয় সত্তা। অর্থাৎ বস্তু একই সঙ্গে প্রয়োগযোগ্য এবং নিজ বিষয়ে সচেতন।"

ফলত এটা প্রমাণিত যে লুকাচ্ লেনিনের সাথে সহমত ছিলেন না। আমরা বিতর্কটা থেকে দূরে সরে থাকতে পরি না।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে in itself এবং for itself কি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?

এদের মধ্যে আর কোন পার্থক্য আছে কি? কান্ট-এর অজ্ঞেয় 'বস্তুসত্তা'-র পরিপ্রেক্ষিতে এঙ্গেলস্-এর এই আলোচনা। কান্ট ও হিউম-এর দর্শনগত মতভেদ আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

হিউম-এর অজ্ঞেয়বাদ-এর বক্তব্য হল বস্তুসত্তা বাস্তবে নেই। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় যা গ্রহণ করে তাই কেবল ইন্দ্রিয় চেতনা। নানা ধরনের অনুভূতি-ই আমাদের মস্তিষ্কে কোন একটি বস্তুর সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করে। মিলিতভাবেই তা বাস্তবে বস্তুটির অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। বস্তু অনুপস্থিত। কিন্তু নানারকম অনুভূতির বাস্তবে অস্তিত্ব আছে। অজ্ঞেয়বাদ বস্তুসত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং অজ্ঞেয়বাদকে বস্তুবাদ ও ভাববাদ থেকে পৃথক দার্শনিক ভাবনা হিসেবেই ধরা হয়। কান্ট কিন্তু বস্তুসত্তার অস্তিত্ব-ই দাবি করেন। কিন্তু তার বাস্তব দশা জানা সম্ভব নয়। তাই তিনি একে অজ্ঞাত বস্তুসত্তা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

মূল প্রশ্নটা এঙ্গেলস্ তার আলোচনায় তোলেন যে বস্তুসত্তা কি মানুষের কাছে সত্যি অজ্ঞেয়?

লুকাচ কান্ট-এর অজ্ঞেয় বস্তুসত্তার ধারণার বিরোধিতা করার সময় এঙ্গেলস্‌কে হেগেলপন্থী ভেবেছিলেন কেন তা জানা যায়নি। কিন্তু একটি নিষ্প্রাণ বস্তুর পক্ষে কি for itself হওয়া সম্ভব? মানব চিন্তায় এই ধরনের বস্তুর ধারণা উন্মোচিত করাই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল। এঙ্গেলস্ এখানে 'বস্তুসত্তা'র ধারণার কোন বিরুদ্ধ ধারণা দিতে চাননি। আলোচনাটা কোন বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বিষয়ে নয় বরং মানুষের ভাবনায় বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কিত। যখনই কোন শ্রেণি 'in itself' থেকে 'for itself'-এ পরিবর্তিত হয়, তা কোন আপাত পরিবর্তন নয়, সার্বিক গঠন ও ভূমিকার পরিবর্তন। ফলে এটা পরিষ্কার যে এঙ্গেলস বস্তুরসত্তার 'in itself' ও 'for us' অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন ব্যাখ্যা করেননি। তার বর্ণনা ছিল এক বস্তুর মানব মনে দ্বিবিধ প্রতিফলন সম্পর্কিত। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলস্ বলেছিলেন যে আমরা বস্তু সম্পর্কে অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারি (তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা ও শিল্পকে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করেন)।

বস্তুসত্তা, ফলে আর অধরা বা অজ্ঞেয় রইল না। তিনি 'in itself' ও 'for us' কথা দুটি বস্তু থেকে মানব মনের অনুভূতির পরিণতিকে ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করেছেন। হেগেলের লেখায় 'in itself' ও 'for us' বাক্যাংশ দুটি বস্তুকে ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বস্তুদশা সম্পর্কে মানুষের ধারণা ব্যাখ্যা করার জন্য এই সম্পর্কটি জরুরিই বা কেন?

কেন লুকাচ্ বললেন না যে হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে অনুশীলনের কোনো সম্পর্ক নেই। অপরদিকে মার্কসীয় দর্শনের মূল কথা অনুশীলন। শুধু হেগেল কেন, কোন দার্শনিকই মার্কসের আগে অনুশীলনের ভূমিকাকে বড় করে দেখেননি। মার্কসের মতে ফয়েবাখও তা করেননি। মানুষের সচেতনতায় বস্তুর অপরিবর্তিত রূপ সম্পর্কে 'in itself' ও 'for us' ধারণার পার্থক্য হেগেলের ভাবনায় কখনো আসে নি। মার্কসের জ্ঞানতত্ত্বের মূল ভিত্তি অনুশীলন এবং হেগেলীয় দর্শনের ভিত্তি ছিল বস্তুর চেতনায় রূপান্তর। তাই এটা শুধু সচেতনতা ও ধারণার দ্বান্দ্বিক মধ্যস্থতা নয় যা হেগেলীয় দর্শনে প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ হেগেল দর্শিত 'in itself' ও 'for us' ধারণার পার্থক্য সম্পর্কিত আমাদের আলোচনায় চেতনা ও বস্তুর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে বস্তুবাদের ভিত্তির উপরই দাঁড় করানো উচিত। এছাড়া যদি আমরা হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব দিয়ে মার্কসীয় অনুশীলনকে বোঝার চেষ্টা করি আমরা আরো বিভ্রান্ত হব। তাই লুকাচের মতে "যে পরিভাষাগত সমস্যাটি এক্ষেত্রে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে সেটি আমাদের সমাধান করতে হবে।" লুকাচের এহেন প্রচেষ্টা সহজ বিষয়টিকে আরো জটিল করেছে।

লুকাচ্ লিখেছেন "এক্ষেত্রে, আমাদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কান্ট বর্ণিত বস্তুত্তার ধারণাটিকে একটি বাধা হিসেবে দেখলে কান্ট-এর জ্ঞানতত্ত্বের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা হবে। অপরদিকে কান্ট তৎকালীন আধুনিকতম বিজ্ঞান যথা নিউটনীয় মহাকাশ বিজ্ঞান থেকে নিজ তত্ত্ব আহরণ করেছেন এবং ওই বিজ্ঞানের ভবিষ্যত সম্ভাবনা থেকে তিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। সেই কারণে তিনি নিশ্চিতভাবে ভেবেছিলেন এই প্রক্রিয়া এক সীমাহীন পরিব্যাপ্তি লাভে সমর্থ। তাঁর 'সমালোচনা' একটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করে, তা হল সমস্ত 'ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান' ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান হিসেবেই থাকবে (বস্তুসত্তার ধারণার বিপরীতে)। এছাড়া ঘটনা বিষয়ক সামগ্রিক জ্ঞান জ্ঞানের গঠনগত সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না অর্থাৎ আমাদের

কথায় বললে বলতে হয় এটি সামগ্রিকতা ও তার বিষয়বস্তুর বিরোধী। কান্ট নিজে অজ্ঞেয়বাদ ও তা সম্পর্কে হিউমের বক্তব্য বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে আলোচনা করেছেন (এছাড়াও তিনি বলেছেন এমন একজনের বিষয়ে যার সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন তিনি হলেন বার্কলি)। তার এই আলোচনাটি "ভাববাদের খন্ডন" গ্রন্থটিতে রয়েছে।"

এ থেকে বোঝা যায় লুকাচ প্রাকৃতিক দ্বান্দ্বিকতা জানতেন না। তিনি প্রকৃতিকে কান্টের দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখতেন। এটা কোথা থেকে বিবর্তিত হল, তাঁর দর্শন সম্পর্কে নাকি বিজ্ঞান সম্পর্কে বোঝা পড়া থেকে তা বোঝার জন্য কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক অনুসন্ধানকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেখাতে হবে। উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যায় লুকাচ্ বর্ণিত বিজ্ঞান অধিবিদ্যা ব্যাতীত আর কিছু নয়। প্রথমত ঘটনাকেন্দ্রিক সামগ্রিক জ্ঞান কেবল ঘটনাসম্পর্কিত জ্ঞান অপেক্ষা বেশি কিছু। দ্বিতীয়ত, একটি কাঠামোগত সীমাকে অতিক্রম করতে সক্ষম। তৃতীয়ত, যেহেতু এটি একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া তাই কান্ট বস্তুসত্তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবনা হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে বস্তুসত্তা বস্তু জগতের ঊর্দ্ধে। প্রকৃতিতে যে দ্বান্দ্বিকতা রয়েছে তা লুকাচ্ স্বীকার করতেন না। আবার বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি কান্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আটকে ছিলেন।

বিজ্ঞান কিভাবে দর্শনকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে এঙ্গেলস "লুড্‌ভিক ফয়েরবাখ" গ্রন্থে লিখেছেন—

> "গত শতাব্দির বস্তুবাদ মূলত ছিল যান্ত্রিক। কারণ সে সময়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যন্ত্রবিদ্যা ও মূলত পার্থিব ও মহাকাশগত বস্তুসমূহের যন্ত্রবিদ্যা যথা মহাকর্ষ বিজ্ঞান নির্দিষ্ট পরিণতি পেয়েছিল। রসায়ন বিদ্যা সে সময় তার শৈশব পেরোয়নি। জীববিদ্যারও একই অবস্থা— প্রাণী ও উদ্ভিদ সমূহ স্থূলভাবে পরীক্ষিত ছিল। তার কার্যক্রমের ব্যাখ্যা করা হত যান্ত্রিক ভাবে। দেকার্তের কাছে জন্তু যা ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদীদের কাছে মানুষ ছিল তা-ই, একটি যন্ত্র। রসায়ন ও জীববিদ্যার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াসমূহ কার্যকর ঠিকই কিন্তু এই সকল যান্ত্রিক নীতি অন্যান্য উচ্চতর নীতি দ্বারা প্রভাবিত। এখানেই সনাতনী ফরাসি বস্তুবাদের সীমাবদ্ধতা লুকিয়ে রয়েছে, যদিও এই সীমাবদ্ধতা সেই সময়ে অনতিক্রম্যই ছিল।
>
> এই বস্তুবাদের দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হল এটি মহাবিশ্বকে এক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে পারেনি। মহাবিশ্ব যে একটি ঐতিহাসিক ভাবে বাধাহীন এক বিকাশের পথে চলেছে তা এই বস্তুবাদ বুঝতে পারেনি। তৎকালীন প্রকৃতিবিজ্ঞান ছিল অধিবিদ্যাগত ও অদ্বান্দ্বিক। এহেন প্রকৃতিবিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বস্তুবাদের পক্ষে এই সীমাবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এটুকুই জানা ছিল যে প্রকৃতি অন্তহীনরূপে গতিশীল। তবে ওই সময়ের ধারণা ছিল এই যে এই গতি বৃত্তাকারে, একইপথে বারবার পরিক্রমণশীল ও বার বার একই ফলে পর্যবসিত।
>
> সৌর জগতের উৎস সম্বন্ধে কান্টের তত্ত্ব (যে সূর্য এবং গ্রহসমূহ জন্মেছিল আলোকোজ্জ্বল, ঘূর্ণায়মান নীহারিকাসমূহ থেকে) উপস্থাপিত করা হয়েছিল ঠিক ওই সময়েই এবং তখনও পর্যন্ত কেবল একটি কৌতূহলের বিষয় বলেই গর্ব হত। পৃথিবীর বিকাশের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, তখন ছিল সম্পূর্ণ অজানা এবং আজকের সজীব প্রাকৃতিক সত্তাসমূহ যে, সরল থেকে জটিল বিকাশের এক দীর্ঘ পরম্পরার ফলশ্রুতি সেই ধারণাকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে উপস্থিত করা সম্ভব হয় নি। প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি তখন অবশ্যম্ভাবী ছিল।"

এঙ্গেলস্-এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তোলা প্রশ্নগুলোর আলোচনা মার্কসীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে জরুরি হলেও উপরোক্ত আলোচনায় কান্টের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বস্তুসত্তা সম্পর্কিত ভাবনার আন্তঃসম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে।

লুকাচ্ সমালোচনা করেছেন সে এঙ্গেলস্ 'বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা' ও 'শিল্প'-কে দ্বান্দ্বিক ও দার্শনিক দিক থেকে অনুশীলন হিসেবে বর্গীভূত করেছেন।

**দর্শন ও অনুশীলন**

দর্শনতত্ত্বে অনুশীলন সর্বজনস্বীকৃত বর্গ নয়। ভাববাদ ও বস্তুবাদ এখানে বিভক্ত। বস্তুবাদও এ বিষয়ে বিবিধ বক্তব্যকে ধারণ করে। তাই এঙ্গেলস্-এর মন্তব্যে যাওয়ার আগে প্রয়োজন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে 'অনুশীলন'-কে সজ্ঞায়িত করা।

ফয়েরবাখ লিখেছেন,

> "এটা ভাববাদের মৌলিক ত্রুটি যে তা পৃথিবীর বস্তুনিষ্ঠতা ও আত্মমুখীনতা (Objectivity and Subjectivity), বাস্তবতা ও অবাস্তবতাকে কেবলমাত্র তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করে ও উত্তর দেয়।

ফয়েরবাখ-এর মতে তত্ত্ব হল অনুশীলনের ফসল। কিন্তু ফয়েরবাখ-এর অনুশীলন মানুষের সচেতন কার্যক্রম নয়। তিনি বিষয়ীগতভাবে তা স্বীকার করেননি। তিনি এর নিষ্প্রাণ বস্তুগত দিকটি মাত্র 'অনুশীলনে' অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

মার্কস 'অনুশীলন' ও 'বিপ্লবী অনুশীলন'-এর কথা তার বহু রচনায় বলেন।

প্রথমত, তিনি জোর দিয়ে বলেন যে অনুশীলনই সকল জ্ঞানের উৎস।

> "চিন্তার বাস্তবতা ও অ-বাবস্তবতার উপর বিতর্কটি, যা অনুশীলন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বিশুদ্ধ পণ্ডিতসুলভ বিষয়।" (*দ্বিতীয় থিসিস,* ফয়েরবাখের সম্বন্ধে থিসিস)

এখানে অনুশীলন হল মানুষের সচেতন, সক্রিয়, ইন্দ্রিয়জ কার্য, বস্তুর (দর্শনের তর্কে) ওপর চেতনার ক্রিয়া, যা বস্তুর চেতনার ক্রমশ সঠিক ধারণা গড়ে তোলে। এটা একটা প্রক্রিয়া যা বস্তুসত্তাকে ক্রমশঃ চেতনার কাছে সহজগম্য করে তোলে। এঙ্গেলস্ লিখেছেন:

> "আমাদের ক্রিয়ার ফলাফল আমাদের দেখা বস্তু সামগ্রী যে বস্তুগত প্রকৃতির প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ, তা প্রমাণ করে।' (*ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিস*)

মার্কসের দ্বিতীয় 'অনুশীলন' হল 'বিপ্লবী অনুশীলন', যেখানে পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত করা ও মানবিক ক্রিয়াকলাপ বা আত্মপরিবর্তনের সমাপতনের কথা তিনি 'বিপ্লবী অনুশীলন'-এর মধ্যে প্রকাশ করেছেন। (*ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিস*)

এবার আমরা দেখব এঙ্গেলস কোন্ অনুশীলনের কথা বলছেন। এঙ্গেলস বলেছেন সেই অনুশীলনের কথা মার্কস যে কথা বলেছেন তার ৪নং থিসিসে। (ফয়েরবাখ) মানবিক অনুশীলন এবং এই অনুশীলনের উপলব্ধিতে সমগ্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা তো এর মধ্যে পড়বেই। তবেই

না মার্কস বলেছেন মানবিক অনুশীলনের সাহায্যে সকল রহস্য যুক্তিনিষ্ঠ সমাধানে পৌঁছবে। শিল্প দুদিক থেকে মানবিক অনুশীলনের আওতাভুক্ত হয়। প্রথমতঃ এর সংশ্লিষ্ট ও এর থেকে উৎপন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ও তার বিকাশের প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব। দ্বিতীয়তঃ পণ্য বিনিময় ব্যবস্থায় মানুষের সচেতন ইন্দ্রিয়জ অংশগ্রহণ এবং তা থেকে উদ্ভূত অর্থনীতির তত্ত্ব ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব-এর সংক্রান্ত তত্ত্বের জন্ম।

মানবিক অনুশীলন কিনা, তা বোঝার জন্য দুটিই মাপকাঠি থাকতে পারে, কার্যটি মানুষের সচেতন, সক্রিয়, ইন্দ্রিয়জ কার্য হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা, আর তার লাগাতার ব্যবহার জ্ঞানের সৃষ্টি করছে কিনা।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শিল্প তাই অবশ্যই অনুশীলন হিসেবে গ্রহণীয়। এ বিষয়ে অন্যান্যদের সমালোচনা তাই সঠিক নয়।

## এঙ্গেলসের প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চা

মার্কসীয় তত্ত্বের ভাণ্ডারে কার্ল মার্কস রচিত ক্যাপিটাল যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে দ্বিতীয় গ্রন্থটি হওয়া উচিত এঙ্গেলস রচিত 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'। এই গ্রন্থেই মার্কসীয় তত্ত্ব ও দর্শন সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গতায় উপস্থিত করা হয়েছে। এঙ্গেলসের প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার তাৎপর্য ও তার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা আজকের সময়ে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মার্কসীয় তত্ত্বচর্চার অঙ্গ। আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জে বি এস হলডেন-এর ১৯৩৯-এ লেখা মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নিয়ে। হলডেন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "এঙ্গেলস সমস্ত বিজ্ঞানকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। ১৮৬১ থেকে তিনি রসায়ন বিজ্ঞানী 'Schorlemmer'-এর সাথে ম্যানচেস্টার-এ সবসময় নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছেন। ১৮৭১ সালে তিনি লন্ডনে আসেন এবং ব্যাপক মাত্রায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনা এবং প্রবন্ধ পড়া শুরু করেন। তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করার ইচ্ছে রাখেন যেখানে তিনি এই বক্তব্যকে তুলে ধরতে চান যে, যে দ্বন্দ্বের নিয়মগুলি ইতিহাসের ঘটনাগুলির আপাত আকস্মিকতাকে নির্ধারণ করে, সেই একই নিয়মগুলির দ্বারা প্রকৃতির গতিবেগ, তার অসংখ্য বিশৃঙ্খলতা সত্ত্বেও নির্ধারিত হয়। যদি এই বইটি রচিত হত, তাহলে বিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তার অপরিসীম গুরুত্ব থাকত।"

হলডেন একথা লিখেছেন 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা'-এর প্রসঙ্গে। প্রথমতঃ বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে এই প্রশ্ন যে এঙ্গেলসের এই বিজ্ঞান চর্চার সম্পর্কে মার্কসের মতামত কি ছিল। তার সহমত ছিল কি?

প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য শাখার মত বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও তাদের লাগাতার আলোচনা এটাই দেখিয়ে দেয় যে তাদের মতামত ছিল যৌথ জ্ঞানচর্চার ফসল।

১৮৭৩-এর ৩০শে মে-তে মার্কস কে লেখা এঙ্গেলসের চিঠির একাংশ—

> "আজ সকালে যখন আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম, প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে নিম্নলিখিত কতগুলি দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র আমার মনে এল: প্রকৃতিবিজ্ঞানের যে বিষয়বস্তু তা হল জড়-পদার্থ এবং তার গতি, পদার্থকে কখনো গতির থেকে আলাদা করা যায় না।
>
> অন্যান্য পদার্থের যে অবস্থান, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া কোনো গতিহীন পদার্থের বিষয় কিছু বর্ণনা করা যায় না। একমাত্র গতির মধ্যেই পদার্থ নিজেকে উন্মোচন করতে পারে। অতএব, প্রকৃতি বিজ্ঞান বস্তুদের একে অন্যের সাথে এবং গতির সাথে সম্পর্ক লক্ষ্য করে এবং বর্ণনা করে।"

প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চার দীর্ঘ সময় পরে এঙ্গেলসের সাথে মার্কসের যে নিয়মিত মতবিনিময় চলেছে, তাদের দু'জনেরই অসংখ্য চিঠি-পত্রে তার নমুনা ছড়িয়ে রয়েছে। ১৮৫৮-তে Darwin-এর 'Origin of Species' পড়ার পর এঙ্গেলস মার্কস-কে লেখেন—

> "আমি এখন ডারউইন পড়ছি, যা এককথায় অসাধারণ, আজ অবধি কখনো প্রকৃতির ঐতিহাসিক বিকাশ প্রমাণ করার এত সুন্দর চেষ্টা হয়নি।"

এর উত্তরে মার্কস লেখেন—

> "ডারউইনের গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আমার সঙ্গে খুব খাপ খেয়ে গেছে যে তা প্রকৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইতিহাসের শ্রেণিসংগ্রামকে সমর্থন করে। তা শুধুমাত্র প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরমকারণবাদ-কে প্রথমবারের মত মৃত্যুর আঘাত হানে, এই নয়, বরং গবেষণামূলকভাবে যুক্তিপূর্ণ অর্থকে প্রতিষ্ঠা করে।"

খুব স্পষ্টভাবেই উঠে এসেছে মার্কসের ভাষায়,- 'class struggle in history from the viewpoint of nature science'—ইতিহাস ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্ক। *অ্যান্টি-ড্যুরিং* গ্রন্থটি প্রথমে বেরিয়েছিল, *Herr Eugen Dühring's Revolution in Science* নামে। যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল জার্মান সমাজতন্ত্রী পত্রিকা *Vorwarts*-এ। এই গ্রন্থটি হল মার্কসীয় দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

এঙ্গেলস যখন *Dialectics of Nature*-লেখার প্রস্তুতিপর্বে বিজ্ঞান চর্চায় ডুবে আছেন, সেই সময় কার্ল মার্কস জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এর নেতা Bebel, Bracke, Bernstien, Liebknecht-এর মতো নেতাদের প্রবল অনুরোধে, এঙ্গেলস-কে দায়িত্ব দেন Eugen Dühring-এর ভ্রান্ত মতধারার বিরুদ্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য প্রস্তুত করার জন্য। Engels জানিয়েছেন যে, *অ্যান্টি-ড্যুরিং* গ্রন্থটি কার্ল মার্কস পুরো পড়েছেন এবং অনুমোদন করেছেন শুধু তাই নয়, এই গ্রন্থে অর্থনীতি সংক্রান্ত অংশটি কার্ল মার্কসেরই লেখা।

*অ্যান্টি-ড্যুরিং*-ই যেহেতু মার্কসীয় দর্শন ও মার্কসীয় তত্ত্বের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ, তাই, স্বাভাবিকভাবেই এর বিতর্কিত অংশগুলোতে মার্কসের সহমত ছিল কিনা এ প্রশ্নের সমাধান জরুরী।

বাস্তবতঃ মার্কস ও এঙ্গেলস তাদের পঠন-পাঠন ও রচনার ক্ষেত্রে এক কার্যবিভাজন করে গিয়েছিলেন। মার্কসের মূল দায়িত্ব দাঁড়িয়েছিল রাজনৈতিক অর্থনীতি অংশে মনোনিবেশ করা, যার ফলাফল দাঁড়িয়েছিল 'Capital' এর সৃষ্টি। অন্যদিকে এঙ্গেলসের দায়িত্ব দাঁড়িয়েছিল দর্শন, প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ে মনোনিবেশ করা ও তাদের সমালোচকদের জবাব দেওয়ায়। ১৮৬৭-এর ২২ জুনের চিঠিতে মার্কস লিখেছেন—

> "তোমার পরিতৃপ্তি আমার কাছে বাকি পৃথিবীর মানুষ যা বলে তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ..."

ঐ চিঠিতেই মার্কস লিখেছেন—

"...আমি হেগেলের আবিষ্কৃত সেই নিয়ম যে শুধু পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়, তাকে উদ্ধৃত করলাম এবং বক্তব্য রাখলাম যে এই নিয়ম একইভাবে ইতিহাস এবং প্রকৃতিবিজ্ঞান-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য"

১৮৬০-এর ১৯শে ডিসেম্বর-এর চিঠিতে মার্কস *Origin of Species* সম্পর্কে লিখেছেন—

"এই হল সেই বই যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃতিগত ঐতিহাসিক ভিত্তি ধারণ করে।"

মার্কসের প্রথম জীবনের রচনাতেও আমরা একই ভাবনা পাই ১৮৪৪-এর *ম্যানাস্ক্রিপ্টস*-এও মার্কস প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বিযুক্ত থাকার জন্য দর্শনকে, দার্শনিকদের সমালোচনা করেছেন, সেখানেও তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞান-কে সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মানুষের সাথে প্রকৃতির ঐক্য স্থাপনই ছিল মার্কসের বিষয়।

*ইকনমিক এণ্ড ফিলজফিক্যাল ম্যানাস্ক্রিপ্টস*-এ মার্কস্ লিখেছেন—

"প্রকৃতি নিজেকে বিমূর্ততায় গ্রহণ করলে, মানব থেকে প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করলে, তা মানুষের কাছে কিছুই নয়"-এর অর্থ যখন কেউ কেউ এমন করেন যে মার্কস একই গ্রন্থে লিখে রেখে গেছেন 'একমাত্র প্রকৃতি-ই হল কোনোকিছু'।"

"*জার্মান আদর্শবাদ* এ তিনি লিখেছেন 'এই সকলের মধ্যে বহিঃস্থ প্রকৃতির গুরুত্ব হল অনাক্রান্ত'।

"*পবিত্র পরিবার*-এ তিনি লিখেছেন 'মানুষ নিজে বস্তুকে সৃষ্টি করেনি এবং এমনকি সে কখনো কোনো সৃজনশীল বা উৎপাদনশীল ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে না যদি না বস্তু আগে থেকেই বিদ্যমান থাকতো'।

*পুঁজি*-তে তিনি লিখেছেন 'একটি বস্তুর অধঃস্থ অংশ সবসময় বাকি থাকে, যা মানুষের সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি'।"

মার্কসের মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক রচনায় আমরা ফিরে আসবো। তার আগে আমরা দেখব এঙ্গেলসের বিজ্ঞান-চর্চার মূল প্রতিপাদ্যটিকে।

তিনটি প্রধান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে এঙ্গেলস তার *প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা*-এর মূল আলোচ্য হিসেবে ধার্য করেছিলেন:

১) কোষ-এর আবিষ্কার

২) শক্তির সংরক্ষণ ও রূপান্তরের নিয়ম।

৩) প্রজাতির (species) বিবর্তনের অবিষ্কার।

প্রথম আবিষ্কারটির তাৎপর্য হল তা জৈব পৃথিবীর অভিজ্ঞতা-কে প্রকাশ করে। দ্বিতীয় আবিষ্কারটি দেখায় যে প্রকৃতি হল আসলে এক অবিরাম প্রক্রিয়া। তৃতীয়টি মানব ইতিহাস-এর প্রাকৃতিক উৎস-কে প্রমাণ করে।

এঙ্গেলস মনে করতেন প্রকৃতি-বিজ্ঞান-এর অগ্রগতি এক সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়েছিল যার দুটি পরিণতির একটি ঘটবে ১) বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য, ২) দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য স্থাপন। তিনি লিখেছেন—

"বিশুদ্ধ প্রায়োগিক আবিষ্কারগুলি, যেগুলি বিপুল পরিমাণে জমা হচ্ছে, সেগুলিকে শুধুমাত্র বিন্যাস অনুযায়ী সাজানোর প্রয়োজনীয়তার জন্যে যে বিপ্লব-কে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের উপর বলপূর্বক ধার্য করা হচ্ছে, তা এমনই এক চরিত্রের যে তাকে প্রকৃতির প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক চরিত্র-কে ক্রমশ বেশী করে চেতনায় নিয়ে আসতে হবে, এমনকি সেই সব প্রয়োগবিদদের-ও চেতনায় যারা তাকে সবচেয়ে বেশী বিরোধিতা করে।"

*প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা* গ্রন্থে সমসাময়িক বিজ্ঞান-কে ভিত্তি করে এঙ্গেলস যেসব আলোচনা করেছেন, তার তাৎপর্য মার্কসীয় ধারার বিশ্লেষণে সবচেয়ে ভালভাবে করেছেন হলডেন-ই।

*প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা* গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করে গেছেন। ১৯৩৯-এ তিনি লিখছেন যেহেতু এঙ্গেলসের *পাণ্ডুলিপি*-টি ১৮৭২ থেকে ১৮৮২-এর মধ্যে লেখা , তাই ৬০ বছর আগের বিজ্ঞান-চর্চাকে অনুধাবন করাই মুশকিল যদি একজন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও তত্ত্বের ইতিহাস না জানেন। তিনি লিখছেন—

"সামগ্রিক বিচারে শক্তি অক্ষয়— এই মতবাদটি তখন সবেমাত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং জীববিদ্যা-য় প্রবেশ করছে। কিন্তু, তখন এই মতবাদ খুবই অসম্পূর্ণভাবে উপলব্ধ হয়েছিল। 'বল', 'গতি' এবং 'vis viva'-এই কথাগুলি যাকে আমরা আজ 'শক্তি' বলি সেই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছিল।"

"গতির মৌলিক আকার", "গতিক্রিয়ার পরিমাপ" ইত্যাদি অংশে এঙ্গেলস সমসাময়িক বিতর্কগুলি, যা শক্তি বিষয়ে অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্ব থেকে জন্ম নিয়েছিল, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এঙ্গেলসের তৎকালীন ব্যবহৃত শব্দ 'vis viva' যার অর্থ ছিল গতির শক্তিকে দ্বিগুণ করা, এখন আর ব্যবহার হয়না এবং বল শব্দটি এখন পদার্থবিদ্যা-য় একটি নির্দিষ্ট অর্থেই শুধু ব্যবহার হয়। হ্যালডেন লিখেছেন—

"এঙ্গেলস বর্তমান আকারে এগুলোকে কখনো প্রকাশ করতেন না শুধুমাত্র এই কারণে যে, জোয়ার ভাঁটা সংক্রান্ত ঘর্ষণ (tidal friction) সম্পর্কে তার পরের প্রবন্ধে তিনি আরও আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন"। হ্যালডেন লিখছেন— "বিদ্যুতের উপর প্রবন্ধটি আরও আগে লেখা হয়েছে। 'Weidemann'-এর অসঙ্গতির সমালোচনা হিসেবে সেটি বেশ কৌতূহল-উদ্দীপক এবং রসায়নিক ক্রিয়া এবং বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগ তাকে আরও কাছ থেকে অনুসন্ধান করার আবেদন নিয়ে সেটি শেষ হয়। এঙ্গেলস-এর মতে এই অনুসন্ধান দুটি ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ফলের দিকে নিয়ে যাবে। এই ভবিষ্যৎবাণী আজকে পুরোপুরি ফলে গিয়েছে। 'Arhenius'-এর 'ionic theory' রসায়ন-কে রূপান্তরিত করেছে এবং 'Thornson's electron theory' পদার্থবিদ্যায় বিপ্লব এনেছে। এখানেও প্রকাশের পূর্বে পাণ্ডুলিপি-টি নিশ্চয় আরও একবার সংশোধন করা হত। ১৮৮২ সালের ২৩শে নভেম্বরে মার্কস-কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি চিহ্নিত করেন যে Siemens ব্রিটিশ এসোসিয়েশন-এর উদ্দেশ্যে তার সভাপতির ভাষণে বৈদ্যুতিক বলের একটি নতুন 'একক মাত্রা'-র সংজ্ঞা দেন, যার নাম 'ওয়াট' (Watt), যা 'রোধ' (Resistance) এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ (Current)-এর গুণের সমানুপাত।

তিনি এদের সঙ্গে ভরবেগ (Momentum) এবং শক্তি (Energy)-র অভিব্যক্তির তুলনা করেন, যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন 'The measure of motion-work' (গতিক্রিয়ার পরিমাপ) নামক প্রবন্ধটিতে। তিনি এখানে চিহ্নিত করেন যে যখন আমরা শক্তির এক আকার থেকে অন্য আকারের রূপান্তর নিয়ে কাজ করছি তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা একটি সরল অনুপাত পাই ('গতির' অনুপাতে 'ভরবেগ' এবং 'বিদ্যুৎ প্রবাহের' অনুপাতে 'বৈদ্যুতিক বল')। কিন্তু, যখন 'শক্তি', 'তাপ' বা 'কাজে' রূপান্তরিত হচ্ছে তখন গতি অথবা

প্রবাহ-কে নিজের সাথে গুণ করে সঠিক মাত্রা-টি পাওয়া যায়। 'অতএব, এটি গতির একটি সাধারণ নিয়ম যেটি আমি প্রথম সূত্রবদ্ধ করি'। আমরা এখন দেখতে পাই কেন তা সম্ভব হচ্ছে। যেহেতু, ভরবেগ এবং বৈদ্যুতিক বল এই দুটির নির্দিষ্ট দিকে গতিপথ রয়েছে, সেহেতু গতি বা বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক উল্টে দিলে, তাদেরও দিক উল্টে যায়। কিন্তু, শক্তি একই থাকে। অতএব গতি বা প্রবাহ এই সূত্রে 'Square' হিসেবে আসবে কারণ $(-x)(-x)=X^2$"

"'জোয়ার ভাঁটা সংক্রান্ত ঘর্ষণ'-এই প্রবন্ধে এঙ্গেলস একটি গুরুতর ভুল করেছিলেন অথবা আরও যথাযথভাবে বলতে গেলে একটি ভুল যা প্রবন্ধটি প্রকাশ করলে গুরুতর হত।"

"অন্যান্য ক্ষেত্রে, কিছু বক্তব্য রয়েছে যেগুলি নিশ্চিতভাবে অসত্য যেমন নক্ষত্র এবং 'Protozoa' উপর অংশগুলি। কিন্তু, এখানে তৎকালীন যুগের অন্যতম জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও প্রাণীবিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়েকজনকে মেনে চলার জন্যে এঙ্গেলস দোষারোপ করা যায় না।"

হ্যালডেন-এর আলোচনায় এঙ্গেলস-এর ক্ষেত্রে যে ত্রুটিগুলি ধরা পড়েছে, তাতে কখনোই মনে হয় না যে মার্কসীয় তত্ত্ব দুর্বল হচ্ছে। বরং এভাবেই একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ আমাদের কাছে প্রকৃতির স্বরূপকে আরও স্পষ্ট ও সত্যের আরও কাছাকাছি নিয়ে যায়।

হ্যালডেন লিখেছেন—

"যখন এই সকল সমালোচনা করা হচ্ছে, এটি অতীব বিস্ময়কর যে কিভাবে তার রচনার পরবর্তী ষাট বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের বিকাশ তিনি পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করেছিলেন।"

"তার দৃঢ় বক্তব্য যে প্রাণ হল 'প্রোটিন' সমূহের একটি বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণ অধিকাংশ প্রাণ-রসায়নবিদ (Biochemist)-দের কাছে অত্যন্ত একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে মনে হয়েছিল, কারণ প্রতিটি কোষের অন্তরে প্রোটিন ছাড়া আরো অন্যান্য জটিল জৈবপদার্থ রয়েছে। কেবলমাত্র শেষ চার বছরে এই ধারণাটি এসেছে যে কিছু বিশুদ্ধ 'প্রোটিন' সত্যিই প্রাণীজগতের সবচেয়ে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে যা হল বিভিন্ন পরিবেশে নিজেদের পুনরুৎপাদন করে সংখ্যাবৃদ্ধি করা।"

হ্যালডেন মূলত একজন বিজ্ঞানী। এঙ্গেলস দর্শনের ক্ষেত্রে কোনো ভ্রান্তি করেছেন কিনা সে বিষয়ে হ্যালডেন-এর মতামতকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব না দেওয়াও যেতে পারে, কিন্তু বিগত শতাব্দীতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন বিজ্ঞানী হিসেবে যখন লেখেন—

"যদি এঙ্গেলসের ভাবনার প্রক্রিয়া আরও পরিচিত হত, পদার্থবিজ্ঞান-এর উপর আমাদের ভাবনাগুলির রূপান্তর, যা গত ত্রিশ বছরে হয়ে চলেছে, তা আরও মসৃণ হত। যদি ডারউইন-এর মতবাদের উপর তার বক্তব্য আরও পরিচিত হত, তাহলে যেমন আমি অনেক কিছু বিশৃঙ্খল চিন্তাভাবনা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারতাম।"

তখন প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এঙ্গেলস-এর *দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ*-এর বিশ্লেষণের চমকপ্রদ সাফল্য আগ্রহ সৃষ্টি করে বৈকি!

## বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শন

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান চর্চার একটা সামগ্রিক চিত্র বা বিশ্লেষণ এখানে আলোচ্য নয়। কিন্তু বহুকাল ধরে দর্শনের সাথে প্রকৃতিবিজ্ঞানের যে সম্পর্ক, বিশেষ করে মার্কসীয় দর্শন যেভাবে প্রকৃতিবিজ্ঞানকে দেখেছে, তাতে জ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির বিকাশের গতি- প্রকৃতি মার্কসীয় দর্শনের বিকাশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে আলোচনায় টেনে আনাটা আবশ্যিক।

এমনই এক তত্ত্ব হল Warner Heisenberg-এর *অনিশ্চয়তার নীতি* (Uncertainty Principle)। ১৯৭২ সালে Heisenberg তার এই বিখ্যাত তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। Heisenberg তার এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে শুধু প্রকৃতি-বিজ্ঞানের স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, এর দার্শনিক তাৎপর্যকেও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। ১৯৩২ সালে তার *system of matrix mechanics*-এর জন্য তিনি নোবেল পুরষ্কার পান। *অনিশ্চয়তার নীতি* ও তার দার্শনিক ব্যাখ্যা এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর ঘটে যাওয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্বায়ন-এর জগতে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মার্কসীয় দর্শন বিরোধী সূত্রায়ন।

Heisenberg-এর *অনিশ্চয়তার নীতি*-র মূল কথা হল—একটি particle-এর অবস্থান (position) এবং গতিবেগ (velocity) যুগপৎ পূর্ণ কাঙ্ক্ষিত সঠিকতায় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। Particle-টির অবস্থান যত নিশ্চিত করা হবে, তত তার গতিবেগ নির্ধারণ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। বিপরীতভাবে একই ধরনের ফলাফল পাওয়া যাবে।

একটি ইলেক্ট্রনের অবস্থান কিভাবে নির্ধারণ করা হয়, যদি একটি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার অর্থ হল ইলেক্ট্রনটি একটি 'Photon' কণার সাহায্যে আঘাত করা। আলোক যেহেতু একটি কণার মত আচরণ করে, তাই এই আঘাত electron-টির ভরবেগ (momentum)-এ পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে electron-টির ভরবেগ-ই পরিবর্তন হয়ে গেল। এই পরিবর্তন হচ্ছে অনির্দেশ্য এবং অনিয়ন্ত্রণযোগ্য। যেহেতু বিদ্যমান quantum theory অনুযায়ী আলোক quantum-এর precise angle-এ lens-এর ওপর নিক্ষেপ আগে থেকেই জানা বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, তাই ইলেক্ট্রনটির গতিবেগের পরিবর্তনের মান ও দিক নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আরও উন্নত ধরনের ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করা হয় তাহলে? উত্তর হল, তাতেও সমস্যা মিটবে না। কারণ, যেহেতু সমস্ত ক্ষেত্রে energy আসবে *quantum* হিসেবে এবং তা একইসাথে *তরঙ্গ* এবং *কণার* ধর্ম প্রদর্শন করে, তাই সব ক্ষেত্রেই একই ধরণের সমস্যা থেকে যাবে।

বিপরীতে, ভরবেগ-এর নিখুঁত নির্ধারণ-এর জন্য প্রয়োজন হল খুব নিম্ন ভরবেগ-এর light quanta। স্বাভাবিকভাবেই তার wave light হবে বেশি। ফলতঃ angle of diffraction হবে বড়; অবস্থান নির্ধারণ ততটাই খুঁতযুক্ত হয়ে যাবে।

Warner Heisenberg লিখছেন (Physics and Philosophy, 1958)—

"একটি ইলেক্ট্রন, ধরা যাক 'E', তার ক্ষেত্রে 'অবস্থান' (position) এবং 'গতি' (volocity)-এই শব্দগুলি তাদের মর্মার্থ এবং তাদের সম্ভাব্য যোগাযোগগুলির ক্ষেত্রে, যথাযথ এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে স্থিরীকৃত বলে মনে হয় এবং এটা সত্যি যে নিউটনীয় মেকানিকস্

(Newtonian Mechanics)-এর গাণিতিক কাঠামোর মধ্যে এই শব্দগুলি হল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত ধারণা। কিন্তু,অনিশ্চিতির সম্পর্কের দৃষ্টি থেকে, এই শব্দগুলি বাস্তবিক অতটা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়, একজন বলতে পারেন যে নিউটনীয় মেকানিক্স-এ তাদের অবস্থানের ক্ষেত্রে তারা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা অতটা নয়। এটি দেখায় যে প্রকৃতির দুর্গম অংশে, যেখানে আমরা শুধুমাত্র বিশদ যন্ত্রের দ্বারা ভেদ করতে পারি, আমাদের জ্ঞানের প্রসার কিছু নির্দিষ্ট ধারণার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন সীমাবদ্ধতা আসবে, সেটা আমরা কখনোই পূর্বে আন্দাজ করতে পারি না, অতএব, ভেদ করার প্রক্রিয়ায়, কিছু সময় আমরা আমাদের ধারণাগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হই যে তার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না এবং কোনো অর্থ বহন করে না। সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ স্পষ্টতার যে শর্ত, সেই শর্তের জন্য জিদ বিজ্ঞানকে অসম্ভব করে তুলবে। আমাদের এখানে আধুনিক পদার্থবিদ্যার দ্বারা একটি পুরোনো জ্ঞানের কথা স্মরণ করে দেওয়া হয় যে যিনি কখনো কোনো ভুল না বলার জিদ ধরে থাকেন, তিনি যেন একেবারে চুপ করে থাকেন।”

বাস্তবতঃ, Heisenberg কান্টের অজ্ঞেয় বস্তুসত্তার থেকেও ভাববাদের দিকে ঘেঁষে আছেন। যে সত্য আমরা উদ্ঘাটন করেছি বলে আপাতভাবে মনে হয়, তাও যে সঠিক নয় সেটাই তিনি পদার্থবিদ্যা ও দর্শনের স্তরে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছেন।

Heisenberg লিখছেন (1958)—

“অতএব, ‘কার্য-কারণ-সম্বন্ধ’-এর নিয়মের ‘a priori’ চরিত্রের পক্ষে কান্ট-এর যুক্তিগুলি আজকে আর প্রয়োগ করা যায় না, স্বতঃ লব্ধ জ্ঞান হিসেবে ‘স্থান’ (space) এবং ‘সময়’ (time)-এর ‘a priori’ চরিত্রের উপর একটি অনুরূপ আলোচনা করা যায়। ফল একই হবে। ‘a priori’ ধারণা যাকে কান্ট একটি অবিসম্বাদী সত্য বলে গণনা করতেন, তার আধুনিক পদার্থবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান নেই।”

Heisenberg-এর পদার্থবিদ্যা বা দর্শন বিষয়ে কোনো বিস্তারিত আলোচনায় আমরা এখানে প্রবেশ করব না। কিন্তু এর তাৎপর্য্য ও স্বরূপ সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলা দরকার।

Heisenberg-এর তত্ত্বকে কোনো বিচ্ছিন্ন তত্ত্ব হিসেবে নয়, সমসাময়িক ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনে যেসব প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের অধিপত্য একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত স্পষ্টভাবেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এ তারই এক অংশ। বিংশ শতাব্দীর ২০-এর দশক থেকে জ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখাতেই বুর্জোয়া মতাদর্শের যে আধিপত্য দেখা গেছে তার সাথে সম্পর্কিত ভাবেই বিজ্ঞানের জগতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী-র প্রকাশ হিসেবে Heisenberg-এর দর্শনকে দেখতে হবে। হাইডেগার যদি শেলিং থেকে দেরিদা-র সূত্রবাহক হয়ে থাকেন তবে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Heisenberg সেই ধারাবাহিকতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাহক বলা যায়। হাইডেগার আর হাইজেনবার্গ দু’জনেরই রাজনৈতিক জীবনের মিল হল দু’জনে ছিলেন হিটলারের সক্রিয় সমর্থক।

Heisenberg-এর *অনিশ্চয়তার নীতি*-এর পদার্থবিদ্যা-গত দিকটি নিয়ে আমরা এখানে কোনো মন্তব্য করব না। কিন্তু তার দার্শনিক প্রভাব সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক মন্তব্য আমরা করতেই পারি।

প্রথমতঃ হাইজেনবার্গের পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত এই তত্ত্বের বহু আগেই Brownian motion-এর কথা আমরা পদার্থবিদ্যায় পেয়েছি যেখানে gaseous পরমাণুর random, movement-এর কথা বলা হয়েছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বরাবরই ল্যাপলেস-এর নির্ধারণবাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেছে, যেখানে ক্ষুদ্রতম কণার সঞ্চরণ ও কার্যকারণ সম্পর্ক ও নিশ্চয়তার চিন্তাগত কাঠামোর মধ্যে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বরাবরই একে দেখেছে অনিবার্যতা ও আপতিকতার অভিন্নতা হিসেবে, যেখানে একটি কণার সঞ্চরণ বেশ কিছুটা কার্যকারণ সম্পর্কের (এখানে অনিবার্যতার পদার্থবিদ্যাগত প্রকাশ)-এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাবে, জানা যাবে; আবার অনেকটা রয়েছে এর বাইরে, যাকে আপতিকতা বলা হয়। দ্বন্দ্বের এই দুটি দিকের অভিন্নতা-তে রয়েছে পারস্পরিক ভেদ। অর্থাৎ অনিবার্যতা কখনও পরিবর্তিত হয় আপতিকতায়। আবার আপতিকতা ও অনিবার্যতা-তে পরিবর্তিত হয়।

আপতিকতার অর্থ কি? এর অর্থ কি এই যে এর পিছনে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে না। না তা নয়। আসলে একটি বস্তুর গতি বা পরিবর্তনের ওপর অসীম সংখ্যক উপাদান প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যার প্রকৃতি ও চরিত্র, মাত্রার বিভিন্নতার অসীম সংখ্যা। স্বাভাবিকভাবেই একে পুরোপুরি (absolute) অর্থে হিসেবের মধ্যে নিয়ে আসা যায় না। প্রাধান্যকারী, নির্ধারক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি বস্তুটির গতি বা পরিবর্তনের একটি অংশ, যাকে কার্যকারণ সম্পর্ক বলা হচ্ছে, তা স্থির করে দেয়, অবশিষ্ট অসীম সংখ্যক উপাদান যা বিচারের মধ্যে চলে আসতে পারে, আবার এখন যেসব উপাদান কার্যকারণ সম্পর্ক গঠন করেছে তার মধ্যে এসে পড়তে পারে, সংযুক্ত হয়ে যেতে পারে নতুন উপাদানসমূহ। এভাবে আপতিকতা ও কার্য-কারণ সম্পর্ক (causality) অভিন্নতা গঠন করে পারস্পরিক ভেদের অবস্থায়।

কান্টের অজ্ঞেয় বস্তুসত্তার যখন বিরোধ করেছে মার্কসীয় দর্শন—তার অর্থ কখনই এমন নয় বস্তুসত্তা জ্ঞেয় চরম অর্থে। কারণ মার্কসীয় দর্শন অস্তিত্ব এবং গতি বা পরিবর্তন-এর স্বীকৃতি ছাড়া অন্য কোনো জ্ঞান-কেই অনপেক্ষ বলে মনে করে না। মার্কসবাদ অনপেক্ষ সত্যের বিরোধী।

Heisenburg বস্তুর অবস্থান ও গতি সম্পর্কে যে জানা-কে চূড়ান্ত নিখুঁতভাবে জানার কথা বলেছেন, মার্কসীয় দর্শন দর্শনগত ভাবে তা অসম্ভব মনে করে। কিন্তু এর থেকে বস্তুসত্তা চূড়ান্তভাবে অজ্ঞেয় কি করে সিদ্ধান্ত হয়, তার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা Heisenburg দেন নি। তার পরীক্ষা থেকে causality-কে কি করে পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়া যায়—তারও কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

প্রফেসার হ্যালডেন ১৯৪১-এ লিখেছিলেন (The Laws of Nature প্রবন্ধে)—

“পজিটিভিস্ট (Positivists)-রা এবং ভাববাদীরা এই বিষয়টি-কে নিয়ে অনেক খেলা করেছেন যে প্রকৃতির বহু নিয়ম, যা বিজ্ঞানীদের দ্বারা সূত্রায়িত, শেষ পর্যন্ত অযথাযথ প্রমাণিত হয়েছে এবং সব নিয়ম-ই তাই হতে পারে। কিন্তু এটা একেবারেই এই কথাটি বলার কারণ নয় যে প্রকৃতিগত এমন কোনো নিয়ম বা ধারা নেই, যার সঙ্গে আমাদের প্রকৃতির নিয়মের বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। একজন বলতেই পারেন যে ইংল্যান্ডের একদম সঠিক আকার যেহেতু তার কোনো ম্যাপ-ই দিতে পারে না, সেহেতু ইংল্যান্ডের কোনো আকার নেই।

যেটা প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে অসাধারণ তা হল সাধারণ ‘আসন্ন মান’-এর খুঁতশূন্যতা। প্রতিটি মানুষের দুটি করে কান রয়েছে—এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়ার আগে একজনকে কয়েক শত-সহস্র মানুষকে দেখতে হবে। পদার্থবিদ্যার অনেক নিয়মের ক্ষেত্রে একই

সত্য প্রযোয্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কেন এমন হয়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হল সমষ্টির পুঞ্জিত রূপ। অনেক ক্ষেত্রে যাদের মধ্যে বেশ বড় ফাঁক ফোকর রয়েছে। 'বয়েল' (Boyle)-এর নিয়ম যে একটি গ্যাসের 'ঘনত্ব' তার 'চাপে'র সমানুপাত এবং 'চার্লস' (Charles)-এর নিয়ম যে একটি গ্যাসের 'আয়তন' তার 'তাপমাত্রা'র সমানুপাত, এগুলি একদম নিখুঁত হত যদি গ্যাসের অণুগুলি এক একটি বিন্দু হত, যাদের কোনো আয়তন নেই এবং যারা একে অন্যকে আকর্ষণ করে না। সাধারণ তাপমাত্রা এবং চাপ-এ এই নিয়মগুলি প্রায় সত্য, কারণ যে স্থানের মধ্যে গ্যাস-টি অবস্থান করছে, তার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ গ্যাসের অণুগুলি দখল করে রয়েছে এবং সময়ের একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশে তারা একে অন্যকে আকর্ষণ করার জন্যে ততটা কাছে আসে। একইভাবে, নক্ষত্রের গতি নিয়ে অলোচনা করার সময়, নক্ষত্রগুলি একে অন্যের থেকে এতটা দুরত্বে থাকে যে খুব ভুলত্রুটি ছাড়া তাদের একটি বিন্দু হিসেবে ধরা যেতে পারে...

"মেণ্ডেলের নিয়মাবলী, যা অনুযায়ী দুটি ধরণ কিছু ক্ষেত্রে ১:১ অনুপাতে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩:১ অনুপাতে উদিত হয়। তত্ত্বগতভাবে সত্যি যখন কোষের কেন্দ্রীয় অংশ (Nucleus)-এর বিভাজনের প্রক্রিয়া খুবই নিয়মিত এবং যখন কোনো ধরন-ই এতটা দূর্বল নয় যে গণনা করার আগে তার মৃত্যু হবে প্রথম শর্তটি কখনোই সত্যি নয় এবং দ্বিতীয় শর্তটি বোধহয় সত্যি নয়। কিন্তু প্রথম শর্তটির ব্যতিক্রম খুবই কদাচিৎ। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন-এর ভুল হয় দশ হাজারে মাত্র একবার। ১:১ অনুপাত কিংবা ৩:১ অনুপাত-এর উপর এর ফল চিহ্নিত করা যাবে শুধুমাত্র কয়েক শত লক্ষ উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর গণনা করে। আপেক্ষিক যোগ্যতার তফাৎ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, তা সত্বেও মেণ্ডেলের অনুপাতগুলি কখনো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রতিপন্ন হয় এবং সাধারণভাবে একটি মোটামুটি ভালো পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করে।"

ক্রিস্টোফার কডওয়েল (পদার্থবিদ্যার সঙ্কট)-এ কার্যকারণ সম্পর্ককে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।—

"আধুনিক বিজ্ঞানের একটি প্রবণতা তৈরী হয়েছে যে 'কার্য-কারণ সম্বন্ধ' নীতিকে 'নিয়তিবাদ'/'নিমিত্তবাদ'-এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা। এডিংটন সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন যে এই দুটি সমার্থক তো দূরের কথা, তারা অসঙ্গত, কারণ এবং কার্যের সম্পর্কের মধ্যে কারণ থেকে কার্য পর্যন্ত শক্তির একটি প্রবাহ বয়ে যায়। এবং সেইজন্যে কারণ-এর ক্ষেত্রে একটি পরিমাণ স্বাধীনতা বজায় থাকে। কিন্তু, যখন প্রত্যেকটি ঘটনা হল সম্পূর্ণভাবে এবং অপরিহার্যভাবে নির্ধারিত, তখন কি করে যে কোনো একটি ঘটনাকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় যখন সেটি সূচনা থেকে পুরোপুরি নির্ধারিত হয় পূর্বের ঘটনার দ্বারা?"

বিজ্ঞান ও দর্শনে সঙ্কট বোঝাতে গিয়ে ঐ বইটিতেই কডওয়েল Quantum Physics-এর জন্মদাতা Planck-কে উদ্ধৃত করেছেন—

"ইতিহাসের একটি অনন্য সময়ে বা মুহূর্তে আমরা বাস করি। এটি হল একটি সংকটের মুহূর্ত, একেবারে আক্ষরিক অর্থে। আমাদের আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত সভ্যতার প্রতিটি শাখায় আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এসে পৌছেছি। এই মূল নীতিটি এখন শুধুমাত্র জনসাধারণের ব্যাপারের বাস্তব অবস্থায় দেখা যায় তা নয়, বরং ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনেও দেখা যায়।

"পূর্বে, ছিল শুধু ধর্ম, বিশেষত তার মতবাদ এবং নীতির ব্যবস্থাগুলি, যা ছিল সন্দেহবাদিতাপূর্ণ আক্রমণের একটি বস্তু। এরপর প্রতিমা-পূজাবিরোধীরা সেইসব আদর্শ এবং নীতি চূর্ণ করতে শুরু করল, যা এতদিন অবধি শিল্প-কলার ক্ষেত্রে স্বীকৃত ছিল। এখন তিনি বিজ্ঞানের মন্দিরে ঢুকেছেন। এখানে আন্তরিকভাবেই একটি বৈজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধ সত্য রয়েছে যে আজকের দিনে কেউ আর কখনও অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু একই সঙ্গে, প্রায় যে কোন একটি অর্থহীন তত্ত্ব যদি তা বিজ্ঞানের নামে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই কোথাও না কোথাও বিশ্বাসী এবং ভক্তদের খুঁজে বার করবে।"

Caudwell-এর রচনায় খুব সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা রয়েছে যে সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি সংকট বিরাজ করছে।

"আদর্শের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপসর্গগুলি প্রায় একই।"

আমরা এই আলোচনায় ইতি টানতে চাই Caudwell-এর একটি উক্তি দিয়ে যার উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞানের জগতে তাত্ত্বিক সংকটের ক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণকে স্পষ্ট করা।

"আইনস্টাইন হল আপেক্ষিকতা পদার্থবিদ্যার জনক এবং প্ল্যানক্ হল কোয়ান্টাম (Quantum) পদার্থবিদ্যার জনক। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দুজনেই 'বিপ্লবী' ছিলেন। এমনকি, প্ল্যানক্-এর বিশ্বাস এবং আইনস্টাইন-এর অনুপলব্ধির, সেইজন্যে, অমীমাংসিতের উপর টেনে তোলার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু, এর মধ্যে রয়েছে কম বয়সী লোকেরা যেমন হেইসেন্‌বার্গ (Heisenburg), স্ক্রডিংজার (Schrodinger) এবং ডিরাক (Dirac), যাদের প্রযুক্তিগত সাফল্যের একইরকম 'বিপ্লবী' চরিত্র রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই নতুন ধারাটি একটি অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য ব্রহ্মাণ্ড-এর ধারণার জন্যে যে পরিশ্রম করছে, তা ক্রমশঃ জনগণের সমর্থন জিততে সফল হচ্ছে।"

## (ক) মার্কসীয় দ্বন্দ্ব এবং তার সঠিক ব্যাখ্যার সংকট।

দ্বন্দ্বের নিয়ম আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-এর ধারণার ক্ষেত্রে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর একটি যৌথ বোঝাপড়ার সূচনার উপর। এখানে আমরা 'দ্বন্দ্ব'-এর ধারণা নিয়ে কাজ করব এবং গত ৮৬ বছর ধরে এই তত্ত্ব অনুশীলন করার সময় যে যে ভুল ধারণা তৈরী হয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করব।

এঙ্গেলস 'দ্বন্দ্বের' ধারণাকে তিনটি নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলেন তার রচিত 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা' গ্রন্থটিতে। তিনি লেখেন—

"অতএব, প্রকৃতি এবং মানব সমাজের ইতিহাস থেকে দ্বন্দ্বের নিয়মগুলি আহরণ করা হয়েছে। তারা আর কিছুই নয় শুধু ঐতিহাসিক বিকাশ এবং চিন্তার এই দুটি ক্ষেত্রের সবচেয়ে সাধারণ নিয়মাবলী। এবং সত্যি, তাদেরকে প্রধানত তিনটিতে নামিয়ে আনা যায়:

"মাত্রা থেকে গুণ-এ রূপান্তর এবং তদ্বিপরীত-এর নিয়ম, পারস্পরিক ভেদ্যতার নিয়ম, নেতির নেতিকরণ-এর নিয়ম।"

এই তিনটি নিয়মই হেগেল বিকশিত করেন, কিন্তু, স্বাভাবিকভাবেই তার ভাববাদী ভিত্তিতে। এঙ্গেলস লেখেন—

"এই তিনটি নিয়ম হেগেল তার ভাববাদী ভঙ্গীতে বিকশিত করেছিলেন শুধু ভাবনার নিয়মমাত্র হিসেবে: প্রথমটি, তার 'যুক্তি'-র প্রথম

অংশে ‘সত্তার মতবাদ’ (Doctrine of Being)-এ; দ্বিতীয়টি তার ‘যুক্তি’-র দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ‘সারাংশের মতবাদ’ (Doctrine of essence)-কে পরিপূর্ণ করে। শেষ অবধি, তৃতীয়টি হল পুরো ব্যবস্থাটির গঠনের জন্যে প্রাথমিক এবং মৌলিক নিয়ম।”

হেগেলের ভুল কোথায় ছিল? এঙ্গেলস উত্তর দেন—

“ভুলটি ছিল এই জায়গায় যে এই নিয়মগুলিকে চিন্তার নিয়ম হিসেবে অন্যায়ভাবে প্রকৃতি এবং ইতিহাসের উপর আরোপ করা হয়েছিল, তাদের থেকে সিদ্ধান্তাদি করা হয়নি। পুরোমাত্রায় চাপিয়ে দেওয়া এবং প্রায়ই আপত্তিজনক আলোচনার ধরণের উৎস হল এটাই। ব্রহ্মাণ্ড-কে একটি চিন্তা-ব্যবস্থা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যে চিন্তা-ব্যবস্থা মানুষের ভাবনার বিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট ধাপের সৃষ্ট, আমরা যদি জিনিষটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারি, তাহলে প্রত্যেক জিনিষ সাধারণ হয়ে যাবে এবং দ্বান্দ্বিক নিয়মগুলি, যা ভাববাদী আদর্শে অত্যন্ত দুর্বোধ্য লাগছিল তা হঠাৎ করে দিনের আলোর মত সাধারণ এবং স্পষ্ট হয়ে উঠল।”

আমরা এখানে তৃতীয় নিয়মটি খুঁটিয়ে আলোচনা করব যা এঙ্গেলসের মতে হেগেলের পুরো ব্যবস্থার গঠনের মৌলিক নিয়ম।

**নেতির নেতিকরণের নিয়ম**

এঙ্গেলস এই বিষয়টি উপস্থাপনা করেন ড্যুরিং-কে উদ্ধৃত করে, তার ড্যুরিং-এর প্রতি সমালোচনায়। এখানে ড্যুরিং-এর সেই লেখার একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল—

“ইংল্যান্ডে পুঁজির তথাকথিত আদিম পুঞ্জীভবন-এর ঐতিহাসিক নক্‌শা হল আপেক্ষিকভাবে মার্কসের গ্রন্থের শেষ অংশ এবং সেটি আরো ভালো হত যদি না দ্বন্দ্বের সাহায্যের উপর ভরসা করে থাকতে হত। হেগেলীয় ‘নেতির নেতিকরণ’-কে, তার থেকে আরও ভালো এবং স্পষ্ট অন্যকিছু না থাকার সুবাদে, এখানে বাস্তবিকভাবেই অতীতের গর্ভ থেকে ভবিষ্যত-কে প্রসব করার উদ্দেশ্যে ধাত্রী হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। ‘ব্যক্তিগত সম্পত্তি’-র লোপ, যা ষোড়শ শতাব্দী থেকে উপরে চিহ্নিত উপায়ে কার্যকরী হয়েছে, হল প্রথম নেতিকরণ। এটির পরবর্তীতে আসে দ্বিতীয় নেতিকরণ, যা ‘নেতির নেতিকরণ’ চরিত্রটি ধারণ করে এবং সেইজন্যে ‘ব্যক্তিগত সম্পত্তি’ পুনর্বহাল হয়, কিন্তু আরও উচ্চতর রূপে, জমি এবং শ্রমের যন্ত্রপাতির সার্বজনীন মালিকানার ভিত্তিতে। এখানে, মার্কস এই নতুন ‘ব্যক্তিগত সম্পত্তি’-কে ‘সামাজিক’ সম্পত্তি বলেছেন এবং এইখানে হেগেলীয় উচ্চতর ঐক্যের আগমন হয়, যার মধ্যে দ্বন্দ্ব-কে ‘Sublate’ করা হয়েছে যাকে হেগেলের কথার খেলা বলা যেতে পারে, একইসঙ্গে অতিক্রম করা এবং সংরক্ষিত করা।”

উপরের উদ্ধৃত অংশটি হল ড্যুরিং যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চান যে মার্কস-এর সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার কিছু নেই, শুধুমাত্র নেতির নেতিকরণ নিয়ে হেগেলীয় ধারণা ছাড়া তারই একটি অংশ। এর উত্তর দিতে গিয়ে এঙ্গেলস মার্কসকে উদ্ধৃত করেন। মার্কসের রচনা থেকে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন ‘নেতির নেতিকরণ’ কি এবং মার্কসীয় ‘নেতির নেতিকরণ’ কি। ‘পুঁজি’-তে মার্কস লেখেন—

“এটি হল নেতির নেতিকরণ। এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি পুনর্বহাল করে, কিন্তু পুঁজিবাদী যুগের স্বোপার্জনের ভিত্তিতে, যার অর্থ হল মুক্তশ্রমিকদের সহযোগিতা এবং জমি ও উৎপাদনের যন্ত্র সামগ্রীর সার্বজনীন অধিকার ও মালিকানা। বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যা ব্যক্তিগত শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট, তার পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তর—স্বাভাবিকভাবেই, একই প্রক্রিয়া তার সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরের চেয়ে যা অতুলনীয়ভাবে বেশী বিলম্বিত, ক্লান্তিকর এবং কঠিন। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যা এখনই বাস্তবিকভাবেই সামাজিক উৎপাদনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।”

এঙ্গেলস ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করেন এবং তার সারমর্ম রাখেন—

“যে কোন মানুষের কাছেই, যে সহজ কথা বোঝে, এর অর্থ হল যে সামাজিক মালিকানা জমি এবং অন্যান্য উৎপাদনের যন্ত্র-সামগ্রীর উপর পরিব্যাপ্ত এবং ব্যক্তিগত মালিকানা উৎপাদিত বস্তু অর্থাৎ ভোগ্য সামগ্রীর উপর পরিব্যাপ্ত। এই বিষয়টিকে একটি ছয় বছরের শিশুকে যাতে সম্পূর্ণভাবে বোঝানো যায়, সেইজন্যে ৫৬ পাতায়, মার্কস বলেছেন যে ‘একটি মুক্ত মানুষদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়, যারা সার্বজনীন উৎপাদন সামগ্রীর মাধ্যমে নিজেদের কাজ করে চলেছেন, যেখানে প্রত্যেকটি আলাদা ব্যক্তির শ্রম-শক্তি সচেতনভাবে প্রয়োগ করা হয় গোষ্ঠীর একত্রিত শ্রম-শক্তি হিসেবে’ যার অর্থ হল সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত একটি সমাজ। তিনি আরও বলেন ‘আমাদের গোষ্ঠীর মোট উৎপাদন হল একটি সামাজিক উৎপাদন’। তার একটি অংশ নতুন উৎপাদন-সামগ্রী হিসেবে কাজ করে এবং সামাজিক রয়ে যায়। কিন্তু, অন্য অংশটি প্রত্যেক সভ্য ভোগ করেন জীবনধারণের উদ্দেশ্যে। তাদের মধ্যে এই অংশটি-র বন্টন সেইজন্যে জরুরী।”

“সম্পত্তি যা একইসঙ্গে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক, এই বিভ্রান্তিকর দোআঁশলা......এবং যেহেতু, মার্কস এই কাজটি হের ড্যুরিং-এর রুচি অনুযায়ী করেননি, সেইজন্যে তাকে আবার সেই তার উঁচু এবং অভিজাত্যপূর্ণ কেতায় ফিরে যেতে হল এবং সম্পূর্ণ সত্যের স্বার্থের বিপরীতে, মার্কসকে অভিযুক্ত করলেন এমন সব জিনিষ নিয়ে, যা হের ড্যুরিং-এর নিজের তৈরী করা।”

মার্কস এবং এঙ্গেলস্-এর কথোপকথন-এর সারমর্ম হল যে সমাজ বিকাশের ইতিহাস নিজে নিজেই এই সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মুখে এসে পড়ে। মার্কস কখনো প্রয়োজন অনুযায়ী নেতির নেতিকরণ-এর দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব-কে চাপিয়ে দেওয়ার চিন্তা করেন নি। এঙ্গেলস্ মার্কস-কে উদ্ধৃত করেন—

“একদিকে যখন বৃহৎ পুঁজির সংখ্যা ক্রমশ কমছে, যারা এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ার সমস্ত সুবিধাগুলিকে দখল এবং একচেটিয়াকরণ করেছে, একই সঙ্গে দুঃখ-দারিদ্র্য, শোষণ, দাসত্ব শৃঙ্খল অধঃপতন এবং বঞ্চনার পরিমাণও বাড়ছে, কিন্তু এর সঙ্গেই বাড়ছে শ্রমিকশ্রেণির বিদ্রোহ। যে শ্রেণিটি সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার একই প্রক্রিয়ার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ, শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং সংগঠিত। যে পুঁজির অধীনে এবং সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতি আর্বিভূত হয় এবং উন্নতি লাভ, সেই পুঁজি আজ উৎপাদন পদ্ধতির একটি প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হয়। উৎপাদন উপায়-এর কেন্দ্রীকরণ এবং শ্রমের সামাজীকিকরণ অবশেষে এমন একটি পর্যায়ে এসে পড়েছে যে পুঁজিবাদের বহিরাবরণ খুব শীঘ্রই বিস্ফোরণ ঘটবে। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যু ঘন্টি বাজছে। দখলদারদের দখলচ্যুত করা হবে।”

অতএব, সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত কায়দায়, মার্কসের অনুপম তাত্ত্বিক সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক অগ্রগতি ইতিহাসের যুক্তি

সম্মত শিখরে উত্তরণ করে। এবং শুধুমাত্র এর পরেই এর প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ সারাংশ-কে মার্কস দার্শনিক বস্তুবাদের ভাষায় তুলে ধরেন।

এঙ্গেলস্ লেখেন "একমাত্র এই পর্যায়ে, ইতিহাস এবং অর্থশাস্ত্র-এর প্রকৃত সত্যের উপর ভিত্তি করে মার্কস তার প্রতিপাদন সম্পূর্ণ করার পরে, তিনি এগোন— 'পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং অধিকারমূলক পদ্ধতি, অতএব পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল, ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি (যা তার শ্রমের ভিত্তিতে তৈরি) তার প্রথম নেতিকরণ। পুঁজিবাদী উৎপাদন, প্রকৃতির অপ্রতিরোধনীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার নিজের নেতিকরণের জন্ম দেয়। এইটি হল 'নেতির নেতিকরণ' এবং এই ভাবেই চলতে থাকে ...।

এইটি হল 'নেতির নেতিকরণ'-এর ধারণা, যাকে কার্ল মার্কস সূত্রায়ন এইভাবেই চলতে থাকে ...। এবং ব্যবহার করেছিলেন প্রকৃতি এবং মানবজাতির ইতিহাস বোঝার জন্যে। এটি এঙ্গেলস্-এর গৃহীত বা সূত্রায়ীত কোনো ধারণা নয়। মার্কস হেগেলের কাছ থেকে দ্বন্দ্বের ধারণার অংশ হিসেবে এই ধারণাটি হস্তগত করেছিলেন এবং অননুকরণীয় সূক্ষ্মতার সহিত সমাজের সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে রূপান্তরিত হওয়ার দার্শনিক প্রতিলিপি-কে বোঝবার জন্যে ব্যবহার করেছিলেন।

'নেতির নেতিকরণ'-এর ধারণার আর্বিভাব এবং ব্যবহারকে মূর্ত এবং সংক্ষেপ করলে, তা দাঁড়ায় এই রূপ—

'নেতির নেতিকরণ'-এই ধারণাটি মার্কস 'দ্বন্দ্বের ধারণা'-র একটি অখন্ড অংশ হিসেবে হেগেলের কাছ থেকে নিয়েছিলেন এবং তার ভাববাদী ভিত্তির থেকে তা আলাদা হওয়ার পর তা মার্কসবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী, 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'-এর একটি অবিবেচ্ছদ্য অংশে পরিণত হয়।

মার্কস শ্রমিক শ্রেণির জন্য তার যে সবচেয়ে অমূল্য অবদান, সেই সমাজতন্ত্রের সামাজিক এবং ঐতিহাসিক যুক্তির দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্যে 'নেতির নেতিকরণ' ধারণাটি ব্যবহার করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির জন্যে সঠিক কর্তব্য সূত্রায়ন করবার উদ্দেশ্যে।

মার্কস, ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার পরিণতি হিসেবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি (জমি এবং উৎপাদন উপায় সামগ্রীর মালিকানা) লোপের দার্শনিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'দ্বন্দ্বের নিয়ম'-এর এই বিশেষ অংশটি ব্যবহার করেছেন।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, দার্শনিক ভাষায়, নীচতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে প্রকৃতি, সমাজ এবং চিন্তার যে বিকাশ তাকে ব্যাখ্যা করতে হলে, 'নেতির নেতিকরণ' হল 'দ্বন্দ্বের নিয়মের' প্রধান অংশ।

'নেতির নেতিকরণ' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস কোনো সর্বাঙ্গীন প্রবন্ধ লেখেননি। এই কাজটি এঙ্গেলস্ সম্পন্ন করেছিলেন, তার 'অ্যান্টি-ডুরিং' গ্রন্থে, তিনি এই ধারণার একটি সম্পূর্ণ তর্জমা করেছিলেন।

এঙ্গেলস্ লেখেন—

> "গণিত শাস্ত্রে-ও একই জিনিস। ধরা যাক, আমরা কোনো একটি বীজগাণিতিক সংখ্যা ধরলাম। উদাহরণ স্বরূপ 'ক'। যদি এটিকে ঋণাত্মক অর্থাৎ নেতিকরণ করা হয় আমরা পাই '–ক'। যদি আমরা সেটিকেও ঋণাত্মক করি অর্থাৎ নেতির নেতিকরণ করি (–ক) দিয়ে (–ক) গুণ করে আমরা পাই (+ক)$^{২}$ অর্থাৎ প্রারম্ভিক ধনাত্মক মাত্রা, কিন্তু উচ্চতর ধাপে, দ্বিতীয় খাতে উপনীত হয়ে"।
>
> "আমরা যদি একটি বার্লির দানা-কে ধরি, এরকম অর্বুদ-নির্বুদ বার্লি দানা জাঁতাকলে গুড়ো করে, জলে ফুটিয়ে এবং ঘন করে আবার খাওয়া হয়। কিন্তু যদি সেরকম একটি বার্লির দানার সাথে এমন পরিবেশের সাক্ষাৎ হয় যা তার জন্যে একেবারে স্বাভাবিক, যদি সে একটি উপযুক্ত জমিতে পড়ে, তাহলে তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার প্রভাবে, তার একটি নির্দিষ্ট রূপান্তর ঘটে তা অঙ্কুরিত হয়; বার্লির দানাটি এক রকমভাবে বাস্তবে আর বিরাজ করে না, তার নেতিকরণ হয় এবং তার জায়গায় একটি গাছের আর্বিভাব হয়, যা তার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তার নেতিকরণ হয়ে। কিন্তু এই গাছটির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কিরকম? সেটি বিকশিত হয়, পুষ্পে সমৃদ্ধ হয়, গর্ভবতী হয় এবং অবশেষে আরও একবার প্রচুর বার্লির দানা উৎপন্ন হয় এবং যখনই এগুলো পরিণত হয় মূল গাছটি মারা যায়, তার আবার নেতিকরণ হয়। অতএব, তাদের 'নেতির নেতিকরণ'-এর পরিণতি হিসেবে আমরা আবার সেই প্রারম্ভিক বার্লির দানা পেলাম, কিন্তু একক মাত্রায় নয় দশ, কুড়ি, ত্রিশ গুণে।"
>
> "উদাহরণ স্বরূপ, প্রজাপতিরা ডিম থেকে উৎপন্ন হয় ডিমের নেতিকরণের মাধ্যমে, কিছু নির্দিষ্ট রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে তারা এগিয়ে চলে যতক্ষণ না তারা যৌন পূর্ণতা লাভ করছে, জোড়া খুঁজে নিচ্ছে এবং সব শেষে তাদের নেতিকরণ হচ্ছে, মিলন সম্পূর্ণ করে স্ত্রী প্রজাপতির অসংখ্য ডিম উৎপন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তারা মারা যায়।"
>
> "আমরা আরও একটি উদাহরণ নিই— প্রাচীন দর্শন ছিল আদিম, স্বতস্ফূর্ত ভাবে বিকশিত বস্তুবাদ। সেই হেতু, সেটি মনন এবং জড়বস্তুর সম্পর্ককে স্পষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু, এই প্রশ্নে স্পষ্টতার প্রয়োজনীয়তা জন্ম দেয় দেহ থেকে আত্মা-কে পৃথক করার মতবাদ, সেখান থেকে এই আত্মার অবিনশ্বরতার দৃঢ় ঘোষণা এবং অবশেষে, একেশ্বরবাদের জন্ম দেয়। অতএব, প্রাচীন বস্তুবাদের ভাববাদের দ্বারা নেতিকরণ হয়। কিন্তু, দর্শনের আরও বিকাশের পথে, ভাববাদ-কে টিকিয়ে রাখা অসাধ্য হয়ে পড়ে এবং তার নেতিকরণ ঘটে আধুনিক বস্তুবাদের দ্বারা। আধুনিক বস্তুবাদ নেতির নেতিকরণ, শুধুমাত্র প্রাচীনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়, কিন্তু প্রাচীন বস্তুবাদের স্থায়ী ভিত্তির সাথে যুক্ত হয় দু হাজার বছরের দর্শন এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং এই দু হাজার বছরের ইতিহাস। সেটি তখন আর শুধুমাত্র দর্শন নয়, কিন্তু একটি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী, যাকে তার নিজের অকাট্যতাকে স্থাপন করতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে 'পৃথকীকৃত বিজ্ঞানের বিজ্ঞান' (science of sciences apart)-এ নয়, কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞানে। অতএব, দর্শন এখানে 'Sublated' অর্থাৎ অতিক্রমিত এবং সংরক্ষিত: আকারের ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত এবং প্রকৃত সারমর্মের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত।"

মার্কসীয় মতবাদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে দর্শনের নেতিকরণের প্রশ্নে এঙ্গেলস্ এখানে নিজে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু তা হল Karl Korsch, George Lukacs কিংবা Althusser-এর ব্যাখ্যার একদম বিপরীত। তারা মার্কসীয় মতবাদের ব্যাখ্যা করেন দর্শনের থেকে কোনো কিছু কম হিসেবে অথবা সম্পূর্ণভাবে দর্শনের প্রত্যাখ্যান হিসেবে (নেতিকরণ হিসেবে নয়)। কার্ল কর্স (Karl Korsch) লেখেন—

> "তারা বরং তাদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্তব্য হিসেবে দেখেন শুধুমাত্র পূর্বের সমস্ত বুর্জোয়া ভাববাদী দর্শন শুধু নয়, একেবারে দর্শন তত্ত্বের আকার ও সারমর্মকে নির্দিষ্টভাবে অতিক্রম এবং বাতিল করাকে ..."

এঙ্গেলস্ কিন্তু একটি সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী রেখেছিলেন তাঁর কাছে মার্কসীয় মতবাদ দর্শনের চেয়ে কিছু অধিক। এখানে, আকারের ক্ষেত্রে দর্শন অতিক্রমিত এবং প্রকৃত সারমর্মের ক্ষেত্রে দর্শন সংরক্ষিত। এটা খুবই পরিষ্কার যে কার্ল কর্স (Karl Korch) মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আর্বিভাবের

প্রকৃতি এবং চরিত্র ব্যাখ্যা করতে ভুল করেছিলেন। তাঁর কাছে দর্শনের প্রকৃত সারমর্ম এবং আকার এই দুটি-ই অতিক্রান্ত। কিন্তু তিনি এটি উপলব্ধি করতে অসফল হন যে দর্শন হিসেবে মার্কসীয় দর্শনের সারমর্ম মার্কসীয় বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সংরক্ষিত । তিনি মার্কসীয় 'নেতির নেতিকরণ' প্রক্রিয়াটি বুঝতে অসফল হন। শব্দটির দার্শনিক অর্থের ক্ষেত্রে 'প্রত্যাখ্যান' এবং 'নেতিকরণ'-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সেই অর্থে, অন্যান্য দর্শনের বিপরীতে মার্কসীয় দর্শন, বিশ্ব-কে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র একটি হাতিয়ার নয়। এর উপর সে এই মত প্রচার করে যে জগৎ-কে একমাত্র তখন-ই সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা এবং বোঝা যাবে যখন তাকে (সমাজ বা বস্তু) পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। অতএব, মার্কসীয় দর্শন, অন্যান্য দর্শনের বিপরীতে, পৃথিবীকে অনুশীলনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করে।

মানবজাতির ইতিহাস অর্থাৎ ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা হল 'বিপ্লবী অনুশীলন'-এর একটি জীবন্ত বিষয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস অপ্রত্যাশিত এবং অচিন্তিত পূর্ব পাক ও বাঁকের সঙ্গে বহু পথের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। বিশেষত, যখন ইতিহাস নিজের বিকাশের একটি 'সর্পিল' পথে এগিয়ে চলে, যখন নিজেদের নেতিকরণ করতে বিপ্লবী অনুশীলন আমাদের ঠেলে দেয়, তখন সবচেয়ে নিষ্ঠুর দায়িত্বটি ইতিহাস আমাদের প্রদান করে। তখন কখনো কখনো আমরা বিস্মৃত হই যে, বিকাশের পথটি সরলরেখা নয়; কিন্তু একটি সর্পিল বা আঁকাবাঁকা পথ; আমরা বিস্মৃত হই যে ধারাবাহিকতার মধ্যে উল্লম্ফন, বিপর্যয় ও ভাঙ্গন থাকবে।

এখন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, যা নিজে একটি পথ-নির্দেশক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং যা নিজে একটি পুনর্মূল্যায়ন এবং পুনরনুসন্ধানের তুলনার নজির, তা কখনো একটি দ্ব্যর্থক এবং অস্পষ্ট ধারণা হতে পারে না। এবং এইখানেই হল সংকট। বিগত একশত বছরের বিপ্লবী অনুশীলন সত্ত্বেও 'দ্বন্দ্বের নিয়ম'-এর ব্যাখ্যায় একটি গভীর সংকট বিরাজ করছে। আমাদের এটি অনুসন্ধান করতে হবে যে বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'দ্বন্দ্বের নিয়ম'-এর ব্যাখ্যায় আদৌ কোনো সংকট বিরাজ করে কি করে না।

## (খ) 'দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা' এবং 'সংকট'

আমরা অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি যে কিভাবে এঙ্গেলস্-এর মৌলিক রচনাগুলি মার্কসবাদের ভিত্তিও বটে। বিগত একশত বছর ধরে তা আক্রান্ত হয়েছে। এবং তিনি হলেন একমাত্র লেনিন, যিনি নিজের কাঁধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন তীব্র শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, যিনি তাঁর গ্রন্থ 'Materialism and Emperio-criticism'-এ প্রবল ভাবে চেষ্টা করে গেছিলেন এঙ্গেলস্-এর পক্ষ সর্মথন করতে। কিন্তু আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে লেনিনের মৃত্যুর পর জনপ্রিয় তথাকথিত 'মার্কসবাদী দার্শনিক'-রা মার্কসীয় মতবাদের উপর আরও তীব্র এবং আরো সর্বব্যাপী আঘাত হানে বিশেষত এঙ্গেল্স-কে আক্রমণের আকারে। আমরা এই প্রবন্ধে, মার্কস বিরোধী তত্ত্ব যেমন Heidegger কিংবা ডেরিডা নিয়ে আলোচনা করিনি। কিন্তু, মার্কসীয় বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা এবং 'সাধারণভাবে মার্কসীয় তত্ত্বে বিকাশের' ক্ষেত্রে Heidegger, Derida, Karl Korsch, George Lukacs বা Althusser কোনো সংকটের সৃষ্টি করেননি। এই বুদ্ধিজীবীদের, যেহেতু সারা বিশ্বের কমুউনিস্টদের বিপ্লবী অনুশীলনের সাথে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই, তাই মার্কসীয় দর্শনের ক্ষেত্রে কোনো সংকট বা সমস্যা সৃষ্টি করবার জায়গায় তাঁরা একেবারেই দাঁড়িয়ে নেই। একমাত্র কমিউনিস্টদের আভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা এবং বিফলতা কেবলমাত্র মার্কসীয় তত্ত্বের এই প্রকার সমস্যার জন্ম দিতে পারে।

বিগত শতাব্দীর ত্রিশ দশকের শেষ দিক থেকে এই দুর্বলতা অনুভূত হতে থাকে। তৎকালীন আন্তর্জাতিক কমুউনিস্ট আন্দোলনের দুইটি বড় পার্টি-র মধ্যে কেউ-ই মার্কসীয় তত্ত্বের উপর Heidegger, Heisenberg, Lukacs এবং Althusser-এর প্রচণ্ড আক্রমণকে উত্তর দেওয়া এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর কোনো যথাযথ চেষ্টা করেননি।

কমঃ স্তালিন এবং কমঃ মাও, লেনিনের মৃত্যুর পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুই প্রধান নেতা, বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের আক্রমণ থেকে মার্কসীয় মতবাদ-কে রক্ষা করার জন্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেননি। অন্যদিকে দুজনেই ভিন্ন উৎস এবং তাৎপর্যের 'বস্তুবাদ' প্রচার করেছিলেন যা মার্কস এবং এঙ্গেলস্-এর 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'-এর কাছে অপরিচিত। স্তালিন এবং মাও-এর দ্বারা 'দ্বন্দ্বের' এই নতুন ব্যাখ্যা আন্তর্জাতিক কমুউনিস্ট আন্দোলনে মার্কসীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর অর্থে এবং তাৎপর্যে গুরুতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। স্বাভাবিকভাবেই, বিগত সত্তর বছর ধরে, অন্যান্য সকল মার্কসীয় তত্ত্বের পথনির্দেশক যে মতবাদ তাকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের মতো অনুযায়ী দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া এবং ভিত্তি ছাড়া মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশ কখনো ঘটানো যাবে না।

কমঃ স্তালিন 'নেতির নেতিকরণ'-কে দ্বন্দ্বের নিয়ম হিসেবে দেখতে অস্বীকার করেন। তার প্রবন্ধে 'দ্বান্দ্বিক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'-এ তিনি 'মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি'-যে বর্ণনা করেন তা চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বারা গঠিত, যাদের মধ্যে দুটি হল 'প্রাকৃতিক মাত্রাগত পরিবর্তন পরিণত হয় গুণগত পরিবর্তনে' এবং 'প্রকৃতির সহজাত দ্বন্দ্ব'-এই দুটি হল এঙ্গেলস্-এর সূত্রায়ন করা তিনটি নিয়মের মধ্যে দুটি। তিনি তার সঙ্গে আরও দুটি নিয়ম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে যোগ করেন— 'সম্পর্কিত এবং নির্ধারিত প্রকৃতি' এবং 'প্রকৃতি হল অনন্ত গতি এবং পরিবর্তনের একটি অবস্থা'। কিন্তু তিনি 'নেতির নেতিকরণ' নিয়মটিকে বা এঙ্গেলস্-এর সূত্রায়িত 'দ্বন্দ্বের তিনটি নিয়মের' একটি নিয়ম, কোনো রকম কারণ বা যুক্তি না দিয়ে প্রত্যাহার করলেন। কেন তিনি এঙ্গেলস্-কে স্বীকার করেছিলেন এবং দ্বন্দ্বের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাকে উদ্ধৃত করেছিলেন এবং কেন তিনি দ্বন্দ্বের নিয়মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক একটি নিয়ম, যাকে মার্কস মানবজাতির প্রতি তার সবচেয়ে অমূল্য অবদান সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে, উপনীত হতে অত্যন্ত সুদক্ষ ভাবে ব্যবহার করেছিলেন, তাকে বাদ দিয়েছিলেন এবং ফলত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন— এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না। কারণ, তিনি তার কোনো রচনায় কোথাও 'নেতির নেতিকরণ' ধারণাটিকে নিয়ে আলোচনা করেননি।

'বিপরীতের ঐক্য' নিয়ে কমঃ স্তালিনের উপলব্ধি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে যখন তিনি লেখেন—

> "যুদ্ধ এবং শান্তির মধ্যে, বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের মধ্যে, জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে কোনো অভিন্নতা থাকতে পারে না, কারণ তারা হল মৌলিকভাবে একে অপরের বিরোধী এবং একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র"।

এইটি দ্বন্দ্বের একটি সঠিক ব্যাখ্যা নয়। তিনি শুধুমাত্র সংগ্রাম-কে স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিপরীতের ঐক্য-কে নয়। তিনি বিপরীতকে দেখেন একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কিত হয়ে বিরাজ করে। এবং এইটি হল মার্কস এবং এঙ্গেলস্-এর প্রাথমিক শিক্ষা। এমনকি তার রচনা 'প্রকৃতির সহজাত দ্বন্দ্ব'-এ তাঁর একপেশেপনা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এঙ্গেলস্-কে আরও একবার উদ্ধৃত করা অর্থপূর্ণ হবে—

"দ্বন্দ্বে 'নেতিকরণ'-এর অর্থ শুধু তার উল্লেখই বোঝায় না, কিংবা কোনো একটি জিনিস বাস্তবে বিরাজ করে না— সেটার ঘোষণাকে বোঝায় না এবং যেমন ইচ্ছে তাকে ধ্বংস করাকে বোঝায় না। বহুদিন পূর্বে স্পিনোজা বলেছিলেন যে 'প্রত্যেক সীমাবদ্ধতা বা নির্ধারণ একই সঙ্গে একটি নেতিকরণ'। এবং আরও, নেতিকরণের প্রকার এখানে নির্ধারিত হয় প্রথমত প্রক্রিয়ার সাধারণ চরিত্র এবং দ্বিতীয়ত প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট চরিত্রের দ্বারা। আমি কেবলমাত্র নেতিকরণ করব না, কিন্তু নেতিকরণ-কে 'Sublate' করব, আমি এমনভাবে প্রথম নেতিকরণের আয়োজন করব যাতে দ্বিতীয় নেতিকরণ থাকে কিংবা সম্ভবপর হতে পারে। কিভাবে? এইটি নির্ভর করে নির্দিষ্ট একক ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট চরিত্রের উপর। আমি যদি একটি বার্লি দানা গুড়ো করে দিই কিংবা একটি পোকাকে মাড়িয়ে দিই আমি তাহলে ক্রিয়াটির প্রথম অংশটি সম্পন্ন করব কিন্তু দ্বিতীয় অংশটিকে অসম্ভব করে তুলব। প্রত্যেক প্রকার জিনিসের নেতিকরণের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপায় রয়েছে যাতে সে একটি বিকাশকে জন্ম দিতে পারে। এবং প্রত্যেক প্রকারের ভাবনা বা ধারণার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একই। অনুকলন (infinitesimal calculus) যে প্রকার নেতিকরণকে অন্তর্ভুক্ত করে, তা ঋণাত্মক বর্গমূল (roots) থেকে ধনাত্মক ঘাতে (Power) তৈরি করতে যে নেতিকরণ ব্যবহৃত হয় তার থেকে ভিন্ন। অন্য সবকিছুর মতো এটাও শিখতে হবে। বার্লি গাছ এবং অনুকলন এই দুটি যে, 'নেতির নেতিকরণ' দিয়ে পরিচালিত হয়, শুধুমাত্র এই সামান্য জ্ঞান আমাদের সফলভাবে বার্লি গাছ চাষ করতে কিংবা 'Differentiate and integrate' করতে সাহায্য করবে না। যেরকম ভাবে, তারের মাপের দ্বারা শব্দের নির্ধারণের নিয়মগুলি সম্বন্ধে এইটুকু জ্ঞান আমাদের ভায়োলিন বাজাতে সাহায্য করবে না। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে সেই 'নেতির নেতিকরণ' যার মধ্যে পর্যায়ান্বিত ভাবে 'ক' লেখা এবং কেটে দেওয়া এই বালসুলভ অভ্যেসটি রয়েছে, কিংবা পর্যায়ান্বিত ভাবে ঘোষণা করা যে একটি গোলাপ হলো একটি গোলাপ এবং একটি গোলাপ নয়, তার থেকে কিছুই ঘটে না, শুধুমাত্র যেই ব্যক্তিটি এই ক্লান্তিকর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করছেন তার মূর্খামি ছাড়া।"

'নেতির নেতিকরণ'-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন একটি সুস্পষ্ট এবং অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণের পর আমরা কখনও অন্ততপক্ষে আমাদের মহান নেতা, কমঃ স্তালিন এবং কমঃ মাও-এর কাছ থেকে নীরবতা কিংবা হাল্কা অমনোযোগী মন্তব্য শুনব বলে আশা করিনি। কিন্তু, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এটাই সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত এবং বেদনাদায়ক ঘটনা।

কমঃ মাও লেখেন—

"এঙ্গেলস্ তিনটে বিভাগ নিয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু, আমার ক্ষেত্রে আমি এগুলির মধ্যে দুটি বিভাগে বিশ্বাস করি না। ('বিপরীতের ঐক্য' হল সবচেয়ে মৌলিক নিয়ম; মাত্রা এবং গুণের একে অন্যের রূপান্তর হল দুই বিপরীত মাত্রা এবং গুণের ঐক্য এবং 'নেতির নেতিকরণ' বাস্তবে আদৌ বিরাজ করে না)। মাত্রা এবং গুণের একে অন্যের রূপান্তর, নেতির নেতিকরণ এবং বিপরীতের ঐক্যের নিয়ম এগুলিকে সম পদস্থে পাশাপাশি রাখা হল 'ত্রৈধত্ব' (triphism), 'একত্ববাদ' (monism) নয়। সবচেয়ে মৌলিক হল বিপরীতের ঐক্য। মাত্রা এবং গুণের একে অন্যের রূপান্তর হল দুই বিপরীত মাত্রা এবং গুণের ঐক্য। নেতির নেতিকরণ বলে কোনো বস্তু নেই। ইতিকরণ, নেতিকরণ, ইতিকরণ, নেতিকরণ— কোনো জিনিসের বিকাশে, একটি ঘটনা প্রবাহের প্রত্যেকটির সংযোগ হল 'ইতিকরণ' এবং 'নেতিকরণ' দুটি-ই। দাস সমাজ আদিম সাম্যবাদী সমাজের ক্ষেত্রে নেতিকরণ কিন্তু সামন্ত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সেটি হল ইতিকরণ; সামন্ত সমাজ দাস সমাজের ক্ষেত্রে নেতিকরণ কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সেটি হল ইতিকরণ; পুঁজিবাদী সমাজ সামন্ত সমাজের ক্ষেত্রে নেতিকরণ কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিকরণ।"

একটি প্রশ্নের উত্তরে কমরেড মাও উপরের কথাগুলি বলেন। প্রশ্নটি ছিল (কমরেড শেং): চেয়ারম্যান কি তিনটি বিভাগের সমস্যার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবেন?

এটি রহস্যময় কিভাবে এবং কেন কমঃ মাও-এর পরিমাপের একজন নেতা 'নেতির নেতিকরণ'-এর মতো বিষয়কে এতটা হাল্কা ভাবে দেখলেন— "নেতির নেতিকরণ বাস্তবে আদৌ বিরাজ করে না।" এই ধারণাকে কার্ল মার্কস্ যে ভঙ্গীতে ব্যবহার এবং তার সারবত্তা স্বীকার করতেন, তাকে সমালোচনা এবং বিশ্লেষণ না করে, দ্ব্যর্থহীনভাবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির এত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশের প্রত্যাখ্যান বাস্তবিকভাবে একেবারে দ্বন্দ্বের ধারণাকেই বাতিল করে দেওয়া।

একই প্রবন্ধে, মাও বলেছেন—

"দর্শনের দুর্বলতা এই জায়গায় যে সেটি কখনো একটি ব্যবহারিক দর্শন তৈরি করেনি, শুধু পুঁথিগত দর্শন তৈরি করেছে।"

'ব্যবহারিক দর্শন', 'পুঁথিগত দর্শন'-এই কথাগুলি মার্কসীয় শাস্ত্রে পুরো মাত্রায় নতুন। মার্কসীয় বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে দর্শনকে অতিক্রম করেছে তার আকারের ক্ষেত্রে। সেটি অতিক্রান্ত এই অর্থে যে অন্যান্য সকল দর্শন জগৎকে ব্যাখ্যা করে তত্ত্ব এবং জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, কিন্তু মার্কসবাদ জগৎকে ব্যাখ্যা করে অনুশীলনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবং একই সঙ্গে সেটি 'বিপ্লবী অনুশীলনের' কর্তব্য স্থির করে।

কিন্তু মার্কসবাদ 'ব্যবহারিক দর্শন' নয় এবং কখনো হতে পারে না। অতএব, জনপ্রিয় বা ব্যবহারিক দর্শন, সকলের জন্য দর্শন— এগুলি হল ক্লাসিকাল মার্কসবাদের কাছে অপরিচিত এবং তার বিপরীত। মার্কস বা এঙ্গেলস্ কখনো দর্শনকে সেভাবে প্রয়োগ করেননি। দর্শন পড়াতে এবং প্রদান করতে অবশ্যই সহজ ভাষার ব্যবহার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু, দর্শনের সেই রূপকে কখনোই 'ব্যবহারিক দর্শন' বলা যায় না। হয়তো কমঃ মাও সেরকম একটি দর্শন তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তার অন্তিম ফলাফল ছিল 'দ্বন্দ্বের' সবচেয়ে মৌলিক ধারণার (হেগেল, মার্কস এবং এঙ্গেলস্-এর দ্বন্দ্ব) তরলীকরণ, ভ্রান্তি এবং এমনকি বিচ্যুতি পর্যন্ত।

দর্শন সংক্রান্ত রচনার মধ্যে তার সবচেয়ে জনপ্রিয় যে রচনাটি 'দ্বন্দ্বে সম্পর্কে', কমঃ মাও 'দ্বন্দ্বের নিয়ম' থেকে 'নেতির নেতিকরণ' ধারণাটি বাদ দিয়ে দেন দ্বন্দ্বের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশটির উপর সম্পূর্ণ নীরবতা বজায় রেখে। তিনি 'বিপরীতের দ্বন্দ্ব'-এর উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং প্রকৃতি, সমাজ বা মননের উচ্চতর পর্যায়ে বিকাশের পথ সম্বন্ধে কিছু বলেননি। এই পথ সরলরেখা না সর্পিল, বিকাশ বা অগ্রগতি পুরোনোকে প্রত্যাখ্যান করে, না তার নেতিকরণ ঘটায়, পুরোনো কি সম্পূর্ণভাবে অতিক্রান্ত হয়, না তার কিছু অংশ সংরক্ষিত থাকে— কমঃ মাও এই সকল প্রশ্নে নীরব থেকেছেন।

যদি 'দ্বন্দ্বের' এই ধারণার সারবত্তাকে স্বীকার করতে হয় এবং দর্শনের বিকাশ হিসেবে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে স্বয়ং মার্কসীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে তার ভিত্তিতে সংশোধন করতে হবে। এবং সে ক্ষেত্রে মার্কস-এর ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা পুনরায় লিখতে হবে, কারণ তার ভিত্তি হল সেই

দর্শন, যে দর্শন 'নেতির নেতিকরণ'-এর ধারণাকে 'দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধারণ করে দার্শনিক ক্ষেত্রে মানবজাতির ইতিহাসকে বিশ্লষণ এবং অনুসন্ধান করে দেখবার উদ্দেশ্যে।

অন্যদিকে, কমঃ মাও ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে কিংবদন্তী বিপ্লবী নেতা। তাছাড়া, আজকের সময়, বর্তমান পৃথিবীর প্রতিটি কোণে বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের সাথে কমঃ মাও-এর নাম জড়িয়ে আছে ('মাওবাদ' বা 'মাও চিন্তাধারা' হিসেবে)। ফলত মাওবাদী বিপ্লবীদের রাজনৈতিক রচনাগুলিতে দ্বন্দ্ব-এর ধারণা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে 'নেতির নেতিকরণ' ধারণাটিকে প্রায় পুরোপুরি পরিহার করা হয়েছে।

পেরু-র কমুউনিস্ট পার্টি-র মৌলিক রচনাগুলি বলছে—

> "মাওবাদের আধেয় সম্পর্কে, তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে, আমরা এই মৌলিক বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে পারি—
>
> মার্কসবাদের দর্শনে, দ্বন্দ্বের সারর্মম, 'দ্বন্দ্বের নিয়ম'-কে তিনি বিকশিত করেন একমাত্র মৌলিক নিয়ম হিসেবে, এবং তাছাড়া 'জ্ঞান-তত্ত্বের' সম্পর্কে তার গভীর দ্বান্দ্বিক উপলব্ধি ছিল, যার কেন্দ্রে রয়েছে দুটি উল্লম্ফন যা এই নিয়মটি গঠন করে (অনুশীলন থেকে জ্ঞান এবং তদ্বিপরীত; কিন্তু জ্ঞান থেকে অনুশীলন হল প্রধান)। আমরা এটা জোরালো ভাবে প্রকাশ করি যে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে 'দ্বন্দ্বের নিয়ম' অত্যন্ত সুচারুভাবে প্রয়োগ করেন। মার্কসের বাকি রেখে যাওয়া কাজকে সম্পূর্ণ করেন।"

দৃশ্যতই, পেরুর কমিউনিস্ট পার্টি এঙ্গেলস্ কিংবা মার্কস-এর দ্বন্দ্ব তত্ত্বের সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন রূপে গণ্য করেননি।

তাদের দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যায় কোথাও 'নেতির নেতিকরণ'-এর কোনো স্থান নেই।

অনুরূপভাবে, নেপালের কমুউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-এর চেয়ারম্যান, কমঃ প্রচন্ড 'মাওবাদ' সম্পর্কে লেখেন—

> "মাও 'দ্বন্দ্বের নিয়ম'-কে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সারমর্ম হিসেবে স্থাপন করেন এবং প্রকৃতি, সমাজ ও মানবজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের মৌলিক নিয়ম হিসেবে স্থাপন করেন। দ্বন্দ্বের সর্বজনীন সত্তার বিশ্লেষণ এবং প্রধান দ্বন্দ্ব-কে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া এবং গুরুত্বকে, তিনি দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যার বিকাশের একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। দ্বন্দ্বের মৌলিক নিয়ম বিপ্লবের রণনীতি এবং রণকৌশল সূত্রায়ন করবার জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা স্পষ্টত প্রতীয়মান।"

কমরেড প্রচন্ড মাও কর্তৃক 'নেতির নেতিকরণ'-এর প্রত্যাখ্যানের উপর কোনো মন্তব্য করেননি।

মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে এই প্রচারগুলি ইতিপূর্বে মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

এক অর্থে, মার্কসীয় তত্ত্বের আদর্শগত এবং তত্ত্বগত সম্ভাবনা এবং তার বিকাশের প্রবণতা বর্তমানে মূলধারার চলমান বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে সংঘাত বাধাচ্ছে। এটি মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের সমস্যাকে বড়ো আকারে বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

## সমসাময়িক তত্ত্বগত সংগ্রামের প্রকৃতি ও কর্তব্য

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে মূলত আলোচনা করেছি মার্কসীয় দর্শন-এর সাম্যবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'-এর তত্ত্বকাঠামো প্রসঙ্গে। মার্কস-এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর মার্কসীয় এই তত্ত্ব প্রণালী সংক্রান্ত (methodological) ও জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্ত (epistemological) দুই দিক থেকেই যে সব অসামঞ্জস্যের মুখে পড়েছে আমরা সেগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। অন্য তাত্ত্বিক বিষয়গুলিতে দৃষ্টিপাত করার আগে আমাদের প্রথমত স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার যে এই বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি-কে মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজ-ইতিহাসের বিবর্তন ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যে অন্তর্নিহিত নিয়ম হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তাতে গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা। সমাজ-ইতিহাসের বিবর্তনের ব্যাখ্যার মার্কসীয় তত্ত্বকাঠামোর মধ্যেই কোনো অসামঞ্জস্য ধরা পড়লে আমাদের অবশ্যই তা বুঝতে বা পুনর্বিচারে রাজি থাকতে হবে। বর্তমান প্রবন্ধে অবশ্যই তেমন কোনো সংশয় বা জিজ্ঞাসার স্থান দেওয়া হয়নি।

কার্ল মার্কস তার গোটা বিচার-বিশ্লেষণের সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেছিলেন মার্কসীয় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Das Capital রচনায়, যেখানে তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার ধ্বংস হওয়ার দিকে যাত্রার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটিকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা ইতিমধ্যেই এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছি।

মার্কস এবং এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর, এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার বছরগুলিতে সাধারণভাবে মার্কসীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে এক শূন্যতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, বিশেষত মাকর্সীয় বিশ্ব-বীক্ষার সার্বিক সমৃদ্ধি সাধন-এর প্রশ্নে। যদিও গত এক শতাব্দী নিবিড় ব্যাপক অনুশীলনের পর উদ্ভূত আজকের সঙ্কটের সাথে তার কোনো তুলনাই চলে না। তবু এ প্রসঙ্গে ১৯০৩-এ লেখা রোজা লুক্সেমবুর্গের একটি রচনা আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করবে। 'মার্কসবাদের বিকাশহীনতা ও প্রগতি' রচনায় তিনি লিখেছিলেন—

"বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা যা লক্ষ্য করছি, তা কি মার্কসীয় বিকাশহীনতার নমুনা?" প্রকৃত ঘটনা হল— ক্যাপিটালের তৃতীয় খন্ডের প্রকাশ এবং এঙ্গেলস শেষ লেখা সমূহের পর থেকে মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে দু-একটি স্বাধীন রচনা ছাড়া বাকী রচনাগুলি অসাধারণ জনপ্রিয় ও ব্যাখ্যামূলক রচনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই তত্ত্বের মর্মবস্তু বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের দুই প্রতিষ্ঠাতা যে স্তরে রেখে গেছিলেন সেখানেই রয়ে গেছে।

ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের মৃতুর আট বছর পর এই ছিল রোজা-র উপলব্ধি। তিনি আলোচনা করেছেন, মার্কসবাদ কি এমনই এক অনমনীয় ভিত্তি কাঠামো তৈরি করেছে যে কারণে পরবর্তী মার্কসবাদীদের স্বাধীন ভূমিকা পালন সম্ভব হয়নি। তিনি লিখেছিলেন—

> "অর্থাৎ, এটা বলা যায় না যে, মার্কসীয় চিন্তা-সৌধের অনমনীয়তা এবং পূর্ণাঙ্গতাই মার্কসের উত্তরাধিকারীদের তাত্ত্বিক বিকাশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থতার কারণ।"

কেন তিনি এভাবে চিন্তা করলেন?

তিনি লিখেছিলেন—

> "তবু শুধুমাত্র অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রেই আমরা শুধু মার্কসের রেখে যাওয়া বীক্ষার ব্যাখ্যায় কমবেশি পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য রাখতে সক্ষম। তার শিক্ষায় সবচেয়ে মূল্যবান অংশ ইতিহাসের বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক ধারণা, যা আমাদের কাছে হাজির রয়েছে শুধুমাত্র অনুসন্ধান

চালানোর এক পদ্ধতি হিসেবে, এমন কয়েকটি উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী অগ্রণী চিন্তা যা এক নতুন দুনিয়ায় প্রবেশ করতে আমাদের জন্য এক আভাস রেখে গেছে, যা অজানা চিন্তাক্ষেত্রে অনন্ত ক্রিয়াশীলতায় স্বাধীন কার্য্যাকলাপে দ্বিধাহীন বিচরণের জন্য আমাদের দরজা খুলে দিয়েছে।”

স্ট্যালিন ও মাও-এর বিপরীতে লেনিন ও রোজা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাদের মত ব্যক্ত করেছিলেন যে— মার্কসীয় দর্শনের প্রশ্নে, মার্কসীয় বিশ্ব-বীক্ষার প্রশ্নে ভ্রান্ত দার্শনিক প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে চালাতে তাদের তত্ত্বকে এক অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়ে গিছেন। লেনিন তার মত অনেক বেশি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তার মতে দার্শনিক বস্তুবাদের ‘সবচেয়ে স্পষ্ট’ এবং ‘পূর্ণ বিস্তার’ সম্বলিত ব্যাখ্যা পাওয়া দায় এঙ্গেলস রচিত (১) ‘লুডভিগ ফরেরবাখ, চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান’, (২) ‘অ্যান্টি-ড্যুরিং’।

তিনি লিখেছিলেন—

“মার্কস এবং এঙ্গেলস সর্বদাই দার্শনিক বস্তুবাদকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সুরক্ষিত করেছেন এবং এই ভিত্তি থেকে প্রতিটি বিচ্যুতির মধ্যে থাকা গভীর ভ্রান্তিকে বারবার ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে এবং পূর্ণ বিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এঙ্গেলস-এর রচনায়, ‘লুডভিগ ফয়েরবাখ’ এবং ‘অ্যান্টি-ড্যুরিং’-এ, যা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টার মতই প্রতিটি শ্রেণি সচেতন শ্রমিকের গাইডবুক।”

খুবই স্পষ্ট যে, “দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ” সংক্রান্ত ধারণার ক্ষেত্রে লেনিন এঙ্গেলসের ব্যাখ্যাকেই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। আমরা অবশ্যই মনে করি যে, দুই মহান নেতা স্ট্যালিন ও মাও ‘বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতার নিয়ম’-এর যে ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন, তা সাধারণভাবে মার্কসীয় তত্ত্বের বোঝাপড়া এবং বিকাশের ক্ষেত্রেই গভীর সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু, এর থেকে এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হওয়া কোনো ভাবেই উচিত নয় বিগত কমপক্ষে পঞ্চাশ বছরে মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, এর জন্য তাঁরাই দায়ী। মার্কস এঙ্গেলস, লেনিন রচিত ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুসারে সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা (necessity) এবং সে যাত্রার বিভিন্ন পথে অগ্রগতির সম্ভাবনা (Chance), যা প্রয়োজনীয়তা (necessity)-র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পারে— তার ঐক্যবদ্ধকরণ। মার্কসবাদ জ্যোতিষবিদ্যালয় নয়, তার কাছে কোনো পূর্ব নির্ধারিত সূত্রায়ন নেই সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদকে সম্পাদন করার। তাদের যুগে বৈপ্লবিক অনুশীলনের পরিকল্পনা তৈরি করার সময়ে এই ‘সম্ভবনাগুলির’ (Chances) সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব ভাবনা এবং মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্তালিন, মাও-এর এই মূল্যায়নগুলির অনেকগুলি সম্পূর্ণ সঠিক হিসেবে প্রমাণিত হয়, একই সঙ্গে কিছু ভ্রান্তি-ও ছিল। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান কমিউনিস্ট পার্টির বুর্জোয়া পার্টিতে রূপান্তরিত হওয়া, ৬০ বছর ধরে কোনো আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের অনুপস্থিতি এবং এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায় পুঁজিবাদী বিশ্বে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোড়ন এবং শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের অনুপস্থিতি সম্পূর্ণভাবে মার্কসীয় তত্ত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান এবং পূর্নমূল্যায়ন করার জমির জন্ম দিয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ‘তত্ত্বগত সংগ্রাম’-এর এক সার্বিক কর্মসূচী তৈরির জন্য কর্তব্যগুলি দায়িত্ব হয়—

1. সমসাময়িক প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দার্শনিক ও মতাদর্শগত তত্ত্বগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে-ই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-কে প্রকৃত অর্থে, ‘বিপ্লবী অনুশীলন’-এর এক তত্ত্ব হিসেবে, সমসাময়িক অধ্যয়ন ও গবেষণার এক জীবন্ত বিষয় করে তুলতে হবে।
2. গত দেড়শ বছরে তত্ত্বের বিভিন্ন শাখার, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (বিশেষভাবে পদার্থবিদ্যার সার্বিক চর্চায়, জ্যোতির্বিদ্যা, সুপ্রজননবিদ্যা, জৈবপ্রযুক্তি, মনোবিজ্ঞান) ভাষাতত্ত্ব, প্রযুক্তি বিজ্ঞান, বাস্তুতন্ত্র বিষয়ক অধ্যয়ন, লিঙ্গ-সংক্রান্ত অধ্যয়ন, নৃতত্ত্ববিদ্যা, জাতিউদ্ভব সংক্রান্ত বিদ্যা, জাত-পাত এবং ধর্ম সংক্রান্ত অধ্যয়নকে মার্কসীয় বিশ্ব-বীক্ষার আলোকে পঠন-পাঠন, ব্যাখ্যা করা, বিতর্ক করা ও বিকশিত করা।
3. মার্কসীয় বিশ্ব-বীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের মহান শিক্ষকদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী অনুশীলন-জাত এবং তার ভিত্তিতে রচিত তত্ত্বসমূহ, ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে থাকা অসঙ্গতিগুলির পূনর্বিবেচনা ও চিহ্নিতকরণ।
4. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি-র বিশ্লেষণ ও পুনর্বিবেচনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন— (i) সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্যায়ে ‘প্রলেতারিয় একনায়কত্ব’ ও ‘প্রলেতারিয় গণতন্ত্রে’র দ্বান্দ্বিক আন্তঃসম্পর্ক। (ii) বিশেষত পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে, সমাজতন্ত্র উত্তরণের পর্যায়ে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাথে উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানার প্রকৃত অর্থে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সম্পর্ক। (iii) পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের দিকে বিপ্লবের অগ্রগতির সাথে উন্নত পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বিপ্লবের আন্তঃসম্পর্ক। (iv) কমিউনিস্ট পার্টিতে ‘গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা’-র ক্রিয়াকালে ‘কেন্দ্রিকতা’ ও ‘প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের’ পারস্পরিক অনুপ্রবেশ (interpenetration) ও রূপান্তর (transformation)-এর প্রকৃত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য; রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পূর্বে ও পরে কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমগ্র প্রলেতারিয়েত-এর আন্তঃ সম্পর্ক, (v) একবিংশ শতাব্দীতে পুঁজির সঞ্চয়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রগুলির বিবর্তন প্রক্রিয়া; এবং সাধারণভাবে একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব পুঁজিবাদ-এর সঙ্কট-এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য।

আজ, পৃথিবীর সর্বত্র সকল দায়িত্বশীল কমিউনিস্ট কর্মী, নেতৃত্ব, গ্রুপ বা পার্টি মার্কসীয় তত্ত্বের এক গুণগত বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তা, আন্তর্জতিক স্তরে সকল দায়িত্বশীল কমিউনিস্ট সংগঠনের মধ্যে ‘প্রশ্ন’ বা ‘বিভ্রান্তি’ হিসেবে জন্ম নিচ্ছে বা বেরিয়ে আসছে। এমনকি, মাওবাদী-রাও এর ব্যতিক্রম নন। বিপরীতে, নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) আন্তজার্তিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুতর তাত্ত্বিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তাকে এক অত্যন্ত স্পষ্ট এবং চিন্তাশীল পদ্ধতিতে জোরালোভাবে প্রকাশ করেছে। সিপিএন(এম) কর্তৃক প্রকাশিত ‘দি ওয়ার্কার, সংখ্যা ১১, জুলাই ২০০৭ সংখ্যায় ‘সাম্রাজ্যবাদ ও একবিংশ শতাব্দীতে প্রলেতারীয় বিপ্লব’ প্রবন্ধে লেখা হয়েছে—

“ইতিহাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিচারের জন্য হাজির করে দিয়েছে। প্রধান নেতার মৃত্যুর পর পরই কোনো রক্তপাত ছাড়াই কেন প্রলেতারীয় একনায়কত্ব তার বিপরীতে রূপান্তর হয়?

কীভাবে শোধনবাদী শক্তিসমূহ এত সহজে প্রলেতারিয় একনায়কত্বের পতন ঘটায় এবং শক্তিশালী রেড আর্মি, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং বিপ্লবী জনসাধারণ-এর কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই পুঁজিবাদ পুনর্বহাল করতে পারে? কমরেড স্ট্যালিন জোরালো দমন-মূলক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও তার নেতৃত্বাধীন পার্টিতে প্রতিবিপ্লবী বিশ্বাসঘাতকদের উত্থান ও টিকে থাকাকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হলেন কেন? চীনের প্রতিবিপ্লব কী এক রাতারাতি ঘটে যাওয়া ক্যুদেতা নাকি এর পেছনে এক দীর্ঘ অধঃপতনের প্রক্রিয়া উপস্থিত ছিল যা ১৯৭৬-এ পরিণতি পেয়েছিল?”

“কমরেড লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে মরণোম্মুখ পুঁজিবাদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। কিন্তু কোন সাম্রাজ্যবাদ শুধু টিকেই যাচ্ছে

না, শক্তিশালীও হচ্ছে? '৭০-এর দেশকে যখন আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বিরোধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল, মাও বলেছিলেন, "হয় বিপ্লব যুদ্ধকে ঠেকাবে, না হয় যুদ্ধ বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটাবে।"

"কিন্তু আজ পর্যন্ত এর কোনোটাই ঘটেনি কেন? ২১ শতকের প্রলেতারীয় বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রজন্মকে এইগুলি এবং এমনই আরও কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সঠিক উত্তর অবশ্যই দিতে হবে।"

আমাদের মতামত হল, এই মুহূর্তে মার্কসীয় তত্ত্বের 'বিকাশের' প্রকৃতি এমন নয় যে প্রচলিত তত্ত্ব-এ কোনো সংযোজন আজকের চাহিদা মেটাতে পারবে। কিছু এলোমেলো এবং একপেশে নতুন তত্ত্ব পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

মার্কসীয় তত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একগুচ্ছ সংগতিপূর্ণ ও সার্বিক তত্ত্ব প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে, সাধারণভাবে সমাজের বিকাশ সম্পর্কে লেনিন-কে পুনরায় উদ্ধৃত করতে পারি—

"বিকাশের ধারণা, বিবর্তনের ধারণা বর্তমানে প্রায় সমগ্র সামাজিক চেতনায় প্রবেশ করেছে, কিন্তু তা করেছে অন্য পথে, হেগেলীয় দর্শনের মাধ্যমে নয়। হেগেলের দর্শনে-কে ভিত্তি করে মার্কস এঙ্গেলস যেভাবে তাদের সূত্র দিয়েছেন বিবর্তন সংক্রান্ত বর্তমান তত্ত্বের তুলনায় তা অনেক বেশি সার্বিক এবং অন্তর্বস্তুতে অনেক বেশি সারগর্ভ। অতিক্রান্ত স্তরের পুনরাবর্তনের মতো বিকাশ, কিন্তু পুনরাবর্তন অন্য একটি উচ্চতর ভিত্তিতে (নেতির নেতিকরণ), সরলরেখায় বিকাশ নয়, বলা যেতে পারে সর্পিলবৃত্ত বা স্পাইরাল আকারে বিকাশ; উল্লম্ফন, ধ্বংস, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বিকাশ; 'ক্রমিকতার ছেদ'; পরিমাণ থেকে গুণে উত্তরণ, একটি বস্তুর ওপর অথবা নির্দিষ্ট ঘটনার পরিসীমার মধ্যে কিংবা একটি সমাজের অভ্যন্তরে সক্রিয় বিভিন্ন শক্তি ও প্রবণতার বিরোধ থেকে, সংঘাত থেকে পাওয়া বিকাশের আভ্যন্তরীণ তাড়না; ..." [লেনিন, 'মার্কসীয় মতবাদ' প্রবন্ধের 'দ্বান্দ্বিকতা' শীর্ষক অংশ, *লেনিন কালেকটেড* ওয়ার্কস, ইংরাজিতে তিন ভল্যুম-এ প্রকাশিত, প্রগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৬৭]

মার্কসীয় বিশ্ব-বীক্ষার এই স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়া এবং জ্ঞানের বিকাশেও প্রযোজ্য। মার্কসীয় তত্ত্বের বর্তমানে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অনেক অংশের নেতিকরণ প্রয়োজন তত্ত্বের বিকাশের স্বার্থেই। এবং তা করতে গিয়ে, এটা মাথায় রাখতে হবে যে বর্জন বা ধ্বংসসাধন নয়, শব্দের দার্শনিক তাৎপর্য্যকে বিবেচনায় রেখে 'নেতিকরণ' হল প্রয়োজনীয়।

মানবজ্ঞানের বিকাশে আমরা এক সর্পিল পথের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, কোনো সরলরেখায় নয়— উল্লম্ফন, ধ্বংস, বিপ্লব এবং ক্রমিকতার ছেদের মাধ্যমে মানবজ্ঞানের বিকাশ।

বিকাশের এই চরিত্র তাই, মানব জ্ঞানের এক উচ্চতর ধাপে যাত্রা, যেখানে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি শহীদের জীবনের দামে অনুশীলিত এবং গৃহীত তত্ত্বকে 'একই সাথে রক্ষিত এবং পেরিয়ে যাওয়া' হবে, হেগেলের ভাষায় (যা ড্যুরিং 'শব্দের ভেল্কিবাজি' বলে নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু কার্ল মার্কস সসম্মানে এবং সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন)। তত্ত্বের সেই সব অংশ এবং অন্তবর্স্তুকে পেরিয়ে যেতে হবে, যা অনুশীলিত তত্ত্বের সাপেক্ষে, সময়ের সাপেক্ষে এবং সর্বোপরি মার্কসীয় বিশ্ব-বীক্ষার বিচারে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অচল; এবং অন্যদিকে তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র বিপ্লবী প্রাণসত্তা, 'সত্যে'র সাথে তার নৈকট্য বাস্তব তত্ত্বের মধ্যে গৃহীত পৃথিবীর যথাযথ এবং বস্তুগত প্রতিফলন, তত্ত্বের মধ্যে থাকা শ্রেণিসমাজের যৌক্তিক এবং দ্বান্দ্বিক বিশেষণ এবং অবশ্যই দার্শনিক বস্তুবাদ যা ঐ সকল তত্ত্বের অন্তর্নিহিত এবং অন্তর্গ্রথিত মর্মবস্তু— তাকে রক্ষা করতে হবে।

**গ্রন্থপঞ্জী:**


1. '*Marxism and the Philosophy of Science: A Critical History'* by Helena Sheehan.
2. '*Marxism and Philosophy'* (1923) By Karl Korsch.
3. '*History and Class Consciousness'* (1923) by George Lukacs.
4. '*Marxism and Hegel*', By Lucio Coletti.
5. *'Lenin & Philosophy'* by Louis Althusser.
6. '*The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature'* by Karl Marx.
7. '*Schelling on Hegel'* by Fredrick Engels.
8. '*Letter from Karl to his Father in Trier'*, 1837 by Karl Marx.
9. '*Dialectical and Historical Materialism*' by J Stalin.
10. '*Lenin before Hegel'* by Louis Althusser.
11. '*The Laws of Nature'* by J.B.S. Haldane.
12. 'Preface', Engles' '*Dialectics of Nature'* by JBS Haldane.
13. '*Leon Rosenfeld's Marxist Defense of Complementarity'* by Anja Skaar Jacobsen.
14. '*Reason in Revolt: Marxism and Modern Science'* by Alan Woods and Ted Grant.
15. '*Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy'* by Fredrick Engels.
16. '*The Historical Fate of Hegel's Doctrine'* by Hegel-by-Hyper Text Resources.
17. '*Materialism and Emperio-Criticism*' by Lenin.
18. '*Anti-Duhring'* by Engels.
19. '*The Holy Family'* by Marx and Engels.
20. '*Theses on Feuerbach*' by Marx.
21. '*The German Ideology'* by Marx and Engels.
22. '*Existentialism and Marxism'*, by Doug Lorimer.
23. '*Retrograde Signs of the Times'* by Engels.
24. '*Economic and Philosophical Manuscript of 1844'* by Karl Marx.
25. '*Marx-Engels Correspondence 1868*' by Marx, Engels.
26. '*Marxism, Science and Class Struggel: The Scientific Basis of the Concept of the Vanguard Party of the Proletariat*' by Bahman Azad.
27. '*Crisis in Physics*' by Christopher Caudwell, 1939.

28. '*Philosophical Notebook*' by Lenin.
29. '*Physics and Philosophy'* by Werner Heisenberg, 1958.
30. '*Talk on Questions of Philosophy'*, August 18, 1964. Selected Works of Mao Tse Tung, IXth volume. [Source: Mao chu-hsi tui P'eng, Hua-ng, Chang, Chou fan-tang chi-t'uan ti p'i-p'an]— Mao Tse Tung.
31. *'On Contradiction'* by Mao Tse Tung.
32. '*Stagnation and Progress of Marxism'* by Rosa Luxemburg, 1903.
33. *'Marxist Doctrine*' by V.I. Lenin.
34. '*Imperialism and Proletarian Revolution in the 21st Century*' [Published in 'The Worker', No. 11, July 2007].
35. '*Fundamental Documents of PCP (Peruvian Communist Party)'*
36. '*On Maoism*' by Com. Prachanda.
37. '*Dialectics of Nature*' by Engels.